নগরের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য রেজিলিয়েন্ট জীবিকায়ন প্রশিক্ষণ মডিউল

ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

নগরের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য রেজিলিয়েন্ট জীবিকায়ন প্রশিক্ষণ মডিউল

ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় প্যানেল
মঈন উদ্দিন আহম্মেদ, ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ
শেখ মহি উদ্দিন, ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ
খাদেমুল রাশেদ, ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ
অমিত দে, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ
ফাতেমা মেহেরুন্নেসা তানি, সেভ দ্য চিলড্রেন
তানজিনা আকতার, গ্লোবাল ওয়ান

সম্পাদনায়
শারমিন রুবা
সফিউল আযম

কৃতজ্ঞতায়
মোঃ ইকরাম হোসেন ভূঁইয়া
জাহিদুল হাসান
মীর সাফায়েত হোসেন

প্রণয়নকাল: ডিসেম্বর, ২০২০

প্রণয়ন সহায়তায়: মো. রেজাউল করিম

স্বত্ব: ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

ভূমিকা

বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চল এবং শহরের প্রাকৃতিক-বিপর্যয় ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে খাপ খাওয়া এবং সহনশীলতা (রেজিলিয়েন্স) অবস্থা ও অবস্থান তৈরীর চেষ্টা অব্যাহত। কর্মসংস্থানের সুযোগের সন্ধানে গ্রামীন মানুষের শহবে স্থানান্তরের সাথে সাথে দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে। বসবাসের সীমিত স্থান এবং আয়ের অপর্যাপ্ত উৎস এই অভিবাসী মানুষের জীবনকে বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। শহরাঞ্চলের বস্তির লোকেরা বেশিরভাগই যথাযথ আশ্রয়, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির (WASH) অপ্রতুলতায় খুব অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে। জীবিকার অপর্যাপ্ত উৎসের কারণে এই মানুষেরা একটি দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ভারী বৃষ্টিপাত, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বজ্রঝড় ইত্যাদি এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ যেমন আগুন, জলাবদ্ধতা, বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব (ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া) ইত্যাদি নগরবাসী, বিশেষ করে বস্তিতে বসবাসকারী মানুষের জন্য বড় ঝুঁকি সৃষ্টি করে। তাদের জীবিকার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মারাত্মকভাবে সম্পদের ক্ষতি করে এবং মানুষের জীবনহানি ঘটায়। কোভিড-১৯ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকার উপর আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত অনেক লোক চলমান কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে তাদের চাকরি এবং আয় হারিয়েছে। সারা দেশে নগর এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ তার দুর্যোগ ঝুঁকির পাশাপাশি নগর জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উপর প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করার চেষ্টা করছে। দরিদ্রদের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকিকে ব্যবস্থাপনাযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বছরের পর বছর ধরে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ নগরের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে একাধিক দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের সহনশীলতা (রেজিলিয়েন্স) তৈরিতে কাজ করছে। ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ নগর-বস্তিতে রেজিলিয়েন্ট জীবিকায়ন প্রশিক্ষণ সহায়িকা নামে একটি সু-সংগঠিত দিকনির্দেশনামূলক নির্দেশিকা তৈরি করেছে। যার মাধ্যমে জাতীয়ভাবে সহনশীলতা (রজিলিয়েন্স) বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস। এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহনশীল (রেজিলিয়েন্ট) জীবিকা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পরিকল্পনা করার জন্য সরকার, আইএনজিও-এনজিও এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষ দুর্যোগ সহনশীলতার একটি কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করবে। এই সহায়িকার কৌশল এবং সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ব্যবহারকারীদের জীবিকার পাশাপাশি তাদের উন্নয়নের উদ্যোগসমুহের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

এই সহায়িকায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় এবং তাদের প্রতিকারগুলো বের করতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশের নগর জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকা উন্নয়নে এই সহায়িকাটি ভবিষ্যতে জলবায়ু, পরিবেশ এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগকে পথ প্রদর্শন করবে বলে আশা করছি।

মোঃ আকমল শরীফ
কান্ট্রি ডিরেক্টর
ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

প্রেক্ষাপট

পরিবেশগত অবনতি, নগর সম্পদের অপর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও পরিচালনা, বেকারত্ব, প্রযুক্তিতে অব্যবস্থাপনাপূর্ণ বিনিয়োগের পাশাপাশি সমাজের অপর্যাপ্ত গতিশীলতার কারণে নগর দারিদ্র্য বাস্তবে গ্রামীণ দারিদ্র্যের চেয়ে জটিল ঘটনা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বব্যাপী, বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রসঙ্গে, স্বীকৃতি এবং গ্রহণযোগ্যতার সাথে নগরায়নের তাৎপর্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। ২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ লোক শহরাঞ্চলে বাস করবে বলে আশা করা হচ্ছে। শহরাঞ্চলে মানুষের এই আগমন প্রচুর সংখ্যক নিম্ন-আয়ের গোষ্ঠীকে বস্তিতে বাস করতে বাধ্য করেছে। এই নগর অঞ্চলে বসবাসকারী অনেক লোক জীবিকার সন্ধানে যথাযথ আশ্রয়, সুপেয় পানী ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ছাড়াই খুব অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবনযাপন করে চলেছে। শহরাঞ্চলে এই দরিদ্র অর্থনৈতিক অবস্থার কারণ জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের অপ্রাপ্যতা।

বাংলাদেশ, একটি অন্যতম জলবায়ু বিপর্যয় ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হওয়ার কারণে প্রতি বছর শহরাঞ্চলে নতুন জলবায়ু অভিবাসী তৈরি করে। সীমাবদ্ধ বসবাসের জায়গা এবং জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের কারণে এই লোকেরা বস্তিতে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে এবং উপার্জনের উৎসের অপ্রতুলতা রয়েছে। এছাড়াও নগরের বস্তিগুলিতে বসবাসকারী লোকেরা ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, জলাবদ্ধতা, বন্যা, ঝড় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্যনির্মিত বিপর্যয়ের মোকাবেলা করছে যা তাদের আশ্রয় ও জীবিকার উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলছে। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, কোভিড -১৯ মহামারীটি নগর জনগোষ্ঠী, বিশেষত বস্তিতে বসবাসকারীদের জীবিকা কার্যক্রমকেও প্রভাবিত করেছে। এমতাবস্থায়, নিম্ন আয়ের মানুষ এবং নগরীর বস্তিগুলিতে বসবাসরত লোকেরা তাদের চাকরি হারিয়েছে, তাদের ব্যবসা বন্ধ করতে হয়েছে এবং ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

সমস্ত বিপর্যয় কেবল জীবনই নয়, জীবিকা কার্যক্রমেও বিশেষত শহুরে বস্তিতে বাসকারী মানুষের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয়গুলো ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে তাদের জীবনযাত্রা পুনর্নির্মাণ এবং পুনরুদ্ধার করতে না দিয়ে এই ক্ষতির বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলো বৃদ্ধির কারণ হয়। বিপর্যয়গুলোর পুনরাবৃত্তির কারণে এই জমে ওঠা নেতিবাচক প্রভাবগুলো নগর বস্তিতে গৃহস্থালিয় জীবিকা কার্যক্রমের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলছে, দারিদ্র্যের আন্তঃপ্রজন্ম গমনকে বেগবান করছে এবং দরিদ্র পরিবারগুলিকে আরও বেশি ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

নগর বস্তিগুলিতে পুনঃবিপর্যয়ের চক্রটি প্রশমিত করার জন্য, পরিবার এবং সমাজে সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকাগুলোকে ভবিষ্যতের ক্ষতি থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। পরিবারগুলি সহনশীল (রিজিলিয়েন্ট) জীবিকায়ন কৌশল অবলম্বন করার সাথে সাথে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস বা এড়ানো এবং নেতিবাচকভাবে সামলানোর কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন কম হবে। এমতাবস্থায়, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পুনরাবৃত্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাবে নগর বস্তির পরিবারগুলি কম ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

নগর-বস্তিতে দরিদ্র মানুষের রিজিলিয়েন্ট জীবিকায়ন প্রশিক্ষণ সহায়িকা হলো মানুষকে সহনশীল (রিজিলিয়েন্ট) জীবিকা কর্মকাণ্ড এবং নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ভরযোগ্য জীবিকার পরিকল্পনায় প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে এবং ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ-এর সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে তৈরি একটি নির্দেশিকা। এটি নগর বস্তি সম্পর্কিত এবং নগর বস্তিগুলোয় স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহনশীল জীবিকায়ন নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন স্তরের প্রাসঙ্গিক অংশীদারগণের সহায়তার জন্য তৈরি একটি অনন্য নির্দেশিকা।

এই প্রশিক্ষণ নির্দেশিকাটি সরকার, আইএনজিও-এনজিও এবং সমাজের জনগণ সহ সকল প্রাসঙ্গিক অংশীদারগণকে দিক-নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করবে। এই মডিউলটির প্রত্যক্ষ উপকারভোগী ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী (নগর দরিদ্র সম্প্রদায়) এবং অপ্রত্যক্ষভাবে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন সংস্থাও এর থেকে উপকৃত হবেন। এর কৌশল এবং নির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা উভয় পক্ষকেই তাদের জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। এই নির্দেশিকাটিতে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো ঝুঁকি মোকাবেলা এবং তার সাথে প্রতিকারগুলি করতেও সহায়তা করবে।

এই প্রশিক্ষণ নির্দেশিকাটি পাঁচ দিনের জন্য একাধিক সেশন নিয়ে গঠিত যাতে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, সহনশীল (রিজিলিয়েন্ট) জীবিকায়ন, সহনশীল (রিজিলিয়েন্ট) জীবিকায়নের ঝুঁকি বিশ্লেষণ, সহনশীল (রিজিলিয়েন্ট) জীবিকায়নের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা এবং ব্যবসায় / জীবিকা নির্ধারণ, সহনশীল (রিজিলিয়েন্ট) জীবিকায়নের পরিকল্পনা, সহনশীল (রিজিলিয়েন্ট) জীবিকায়নের হিসাব পরিচালনা, নেতৃত্বের বিকাশ এবং সহনশীল (রিজিলিয়েন্ট) জীবিকায়নের প্রচারের মত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি যাতে

অংশগ্রহণে উৎসাহ হয় অবশ্যই এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত। তবে, বেশিরভাগ অধিবেশনগুলি মুক্ত-আলোচনা, ছোট দলে আলোচনা, ব্রেইন-স্টর্মিং, স্বতন্ত্র কাজ এবং দলগত কার্যাদি সহ একটি অভিজ্ঞতার মডেল অনুসরণ করে পরিচালিত হবে।

যেহেতু বাংলাদেশের নগর সমাজের জন্য জীবিকা কার্যক্রমের কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই, এই নির্দেশিকাটি লোকদের যে কোনও দুর্যোগ সহ্য করতে এবং তাদের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বিকল্প জীবিকা কর্মকাণ্ড খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।

ছবি: ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

প্রশিক্ষণ সহায়িকা ব্যবহার-বিধি

১. প্রশিক্ষণ সহায়িকা ব্যবহার-বিধি

প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রস্তুতের সময় যেমন কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয় তেমনি সেটি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি মূলত 'নগর-বস্তিতে সহনশীল জীবিকায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। সেজন্য সহায়িকাটি ব্যবহারের সময় একজন সহায়কের নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা ও অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়:

- এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি অপরিবর্তনীয় নয়। একজন সহায়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও ধারাবাহিকতা অনুধাবন করে এতে সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারেন। তবে সেই সংযোজন/বিয়োজন যেন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে। অধিবেশনের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে অধিবেশনের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করুন।

- প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে অধিবেশনের উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা আছে। একজন সহায়ক হিসেবে আপনি যে অধিবেশনটি পরিচালনা করবেন সেখানে আপনার প্রধান দায়িত্ব হলো অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে অধিবেশনটি পরিচালনা করে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন করা।

- অধিবেশনটি পরিচালনার জন্য যে সকল উপকরণ/এইডএর প্রয়োজন হবে তা উল্লেখ করা আছে। এ সব উপকরণ/এইডগুলো আগে থেকে সংগ্রহ বা প্রস্তুত করে রাখুন। সময়মত প্রস্তুতি না নিলে অধিবেশন পরিচালনার সময় ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

- অধিবেশন পরিচালনার আগেই প্রতিটি অধিবেশনের পাঠ-সহায়কের চুম্বক অংশ নিয়ে 'পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন' তৈরি করে নিতে হবে। এতে অপ্রত্যাশিত সমস্যা এড়ানো সম্ভব হবে।

- আপনি যদি অধিবেশন নির্দেশিকা দেখে দেখে সেশন পরিচালনা করেন তাহলে আপনার প্রতি অংশগ্রহণকারীদের আস্থা কমে যেতে পারে এবং অধিবেশনের গতি ও সৌন্দর্য ব্যাহত হতে পারে। অধিবেশন নির্দেশিকায় পদ্ধতি, সময়, প্রক্রিয়া ও উপকরণ/এইড এর কথা উল্লেখ করা আছে। আপনি অধিবেশন পরিচালনার আগে নির্দেশিকা ও সংশ্লিষ্ট উপকরণসমূহ ভালোভাবে পড়ে প্রস্তুতি নিন।

- কোনো বিষয়ের উপর আলোচনার সময় বিষয়টি বিশ্লেষণ ও পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মতামত ও উদাহরণ তুলে ধরুন। পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য হ্যান্ডআউট ও সংযুক্ত উপকরণসমূহ ভালোভাবে পড়ুন, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেফারেন্স উপকরণের সহযোগিতা নিন।

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে আলোচনাগুলো যেন বিচ্ছিন্ন মনে না হয় সেজন্য প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে ভূমিকা দিন, পূর্ববর্তী অধিবেশনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুন এবং অধিবেশনের শেষে সেই অধিবেশনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করুন।

- কোর্স শেষে প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া জানুন এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

- আলোচনার শুরুতে খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রশিক্ষণের পরিবেশটি যেন অনানুষ্ঠানিক হয়। এতে করে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সহজে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে।
- অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত রাখার জন্য মাঝে মাঝে ছোটোখাটো বিনোদন বা খেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষককে প্রথমে উদ্যোগ নিতে হবে।
- যেসব উপকরণ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করবেন সেগুলো আগে থেকেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে ঠিকমত যাচাই করে নেবেন যাতে যথাসময়ে বিতরণ করা যায়।

২. মডিউলে সন্নিবেশিত বিষয়সমূহ

এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটিতে যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে– কোর্সের সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ, কারিকুলাম আউট-লাইন, প্রশিক্ষণ সূচি, প্রতিটি অধিবেশনের শিরোনাম, সহায়ক অনুসরণিকা/গাইড, ফ্লিপচার্টের নমুনা, নমুনা চিত্র, হ্যান্ডআউট, অধিবেশন মূল্যায়ন, দৈনিক মূল্যায়ন এবং কোর্স মূল্যায়ন ছক।

উদ্দেশ্য

নির্দিষ্ট অধিবেশন সমাপ্তির পর অংশগ্রহণকারীগণের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কী ইতিবাচক পরিবর্তন হবে, অর্থাৎ প্রতিটি অধিবেশনের শিখন উদ্দেশ্য কী, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যসমূহ অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ককে পথ-নির্দেশনা প্রদান করবে।

অধিবেশন নম্বর

প্রতিটি অধিবেশনের জন্য পৃথক অধিবেশন নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে যাতে সহায়ক বিষয়গুলো সহজে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময়

যেহেতু প্রতিটি কোর্স পরিচালনার জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট থাকে সেজন্য একটি অধিবেশন শেষ করতে মোট কতক্ষণ সময় লাগতে পারে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি সহায়ককে অধিবেশনটি পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সহায়তা করবে।

প্রশিক্ষণ উপকরণ/এইড

কোনো অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কিছু উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। সেজন্য একটি নির্দিষ্ট অধিবেশন পরিচালনার জন্য কোন্ কোন্ উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী প্রয়োজন হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী উপকরণ সংগ্রহ, প্রণয়ন বা ফটোকপি করার ব্যাপারে সহায়ক আগে থেকেই যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন।

৩. অধিবেশনে সন্নিবেশিত বিষয়সমূহ

প্রতিটি অধিবেশনে যে সকল বিষয় সন্নিবেশন করা হয়েছে সেগুলো হলো:

সহায়ক অনুসরণিকা/গাইড/নির্দেশিকা

প্রতিটি অধিবেশনের কার্যক্রমকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। অধিবেশনের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীগণ যে কর্মসম্পাদন করবেন তা এখানে ধাপে ধাপে উল্লেখ করা হয়েছে। সহায়ক অনুসরণিকায় ৩টি কলামের একটি ছকে তৎপরতা/প্রক্রিয়াসমূহ উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পদ্ধতি ও সময়

প্রথম কলামে পদ্ধতির নাম ও সময় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক কোন পদ্ধতিতে এবং কত সময়ে তৎপরতা/প্রক্রিয়াসমূহ পরিচালনা করবেন তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এতে সহায়ক নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন করে সঠিকভাবে অধিবেশন পরিচালনা করতে পারবেন।

প্রক্রিয়া

দ্বিতীয় কলামে প্রক্রিয়া বা তৎপরতাসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীদের যে সব তৎপরতা সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন কাজের পরে কোন কাজ করতে হবে তা এখানে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিবেশন পরিচালনার জন্য এই প্রক্রিয়া সহায়কের পথ-নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে।

উপকরণ/এইড

তৃতীয় কলামে উপকরণ/এইড এর নাম লেখা আছে। প্রতিটি ধাপ পরিচালনার জন্য সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীদের জন্য যে সব উপকরণের প্রয়োজন হবে তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সহায়ক সঠিক উপকরণ নির্বাচন, ব্যবহার ও সরবরাহ করতে পারবেন।

সংযুক্ত উপকরণ

প্রতিটি অধিবেশন নির্দেশিকার পরে অধিবেশন পরিচালনা, অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন, রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল বা উপকরণ হিসেবে সহায়ককে সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (ফরম্যাট, উদ্দীপক, খেলার নিয়মাবলি, হ্যান্ডআউট, ভিডিও, অনুশীলন শিট) সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশন নম্বরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংযুক্ত উপকরণের নম্বর দেয়া হয়েছে। সহায়ক সহজে এগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

অধিবেশন মূল্যায়ন পত্র

প্রায় প্রতিটি অধিবেশনের সাথে অংশগ্রহণকারীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য একটি করে নমুনা মূল্যায়ন পত্র সংযোজন করা হয়েছে। যা সহায়ককে অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীরা কতটা শিখতে পারল, অধিবেশন পরিচালনার মান কেমন ছিল ইত্যাদি বিষয় মূল্যায়নে সহায়তা করবে।

৪. প্রশিক্ষণ সহায়িকার নমনীয়তা

যদিও প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি কোর্স পরিচালনার জন্য একটি নির্দেশনা পত্র/গাইডলাইন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে তথাপি সহায়িকাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন সহায়কের নিম্নলিখিত নমনীয়তার সুযোগ আছে। যেমন:

- অংশগ্রহণকারীদের স্তর/ধরন, জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রত্যাশা বিবেচনা করে প্রস্তাবিত পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, সময়, উপকরণ ইত্যাদি পরিবর্তন করা যাবে। প্রয়োজনে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সংযোজন করে সেই অনুযায়ী নতুন ধাপ ও বিষয় সংযোজন করার সুযোগ রয়েছে।

- অধিবেশনকে অধিক অংশগ্রহণমূলক করার জন্য প্রয়োজনে সহায়ক উল্লিখিত পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন বা নতুন কোনো পদ্ধতি অবলম্বনে অধিবেশন পরিচালনা করতে পারেন।

- একটি অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত মোট সময়কে ঠিক রেখে প্রয়োজনে বিভিন্ন ধাপের সময়ে পরিবর্তন আনতে পারেন। আবার প্রয়োজনে একাধিক অধিবেশনের সময় পুনঃনির্ধারণ করে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন।
- চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষণ সহায়িকায় সংযোজিত হ্যান্ডআউট ও অন্যান্য উপকরণসমূহ পরিবর্তন করতে পারেন। কেননা এ মুহূর্তে যা উপযোগী আগামীতে তা আরও সময় উপযোগী করার প্রয়োজন হতে পারে। তাই চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই হ্যান্ডআউট ও উপকরণগুলোর পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা যেতে পারে।

- বাস্তবতার নিরিখে এই প্রশিক্ষণ নির্দেশিকার সব কিছুই পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাবে। তবে তা যেন শুধু পরিবর্তনের জন্যই বা নিজের কর্তৃত্ব প্রদর্শন করার জন্য না হয়। পরিবর্তন যেন হয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণের দাবিতে। এই পরিবর্তনের ফলে সহায়িকাটি কোনো ক্রমেই যেন গুণগত মান হারিয়ে না ফেলে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

৫. প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

এই প্রশিক্ষণটি সম্পূর্ণ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। তবে এখানে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতিতেই অধিকাংশ অধিবেশন পরিচালিত হবে। এখানে যে কয়েকটি পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণটি পরিচালিত হবে সেগুলো নিম্নরূপ:

- মুক্ত আলোচনা
- ছোট দলে আলোচনা
- ব্রেইন স্টর্মিং বা মুক্ত চিন্তার প্রবাহ
- একক কাজ ও ছোট দলে কাজ

প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বড় দলে আলোচনা

এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষক/সহায়ক আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীদের মতামত নেবেন, তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা করবেন। মাঝে মাঝে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত বা খোলা প্রশ্ন করবেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদেরকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেবেন। এখানে তিনি অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেবেন এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

ছোট দলে আলোচনা

এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে আলোচনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর উপায়। এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদেরকে ৪/৫ জনের ছোট ছোট দলে ভাগ করা হয় এবং দলে আলোচনা করার জন্য কোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করে দেয়া হয়। দলীয় আলোচনার সময় প্রশিক্ষক/সহায়ক তাদেরকে সহায়তা করবেন, প্রয়োজনীয় উপকরণ দেবেন এবং বসার উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করে দেবেন। প্রশিক্ষক/সহায়ক আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। দলের সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্যে একজন নেতা ঠিক করে নেবেন। তিনি নেতৃত্ব বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দলীয় আলোচনার বিষয়গুলো ফ্লিপশিটে লিখে সেগুলো সকলের সামনে উপস্থাপন করবেন এবং কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে তা বুঝিয়ে দিবেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে একক কাজ প্রশিক্ষণ পদ্ধতিটি একটি কার্যকর পদ্ধতি। প্রশিক্ষণার্থী কোনো বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কতটুকু জানেন বা ধারণা রাখেন তা সম্পর্কে সহায়ক/প্রশিক্ষক মূল্যায়ন করতে পারবেন।

ব্রেইন স্টর্মিং বা মুক্ত চিন্তার প্রবাহ

এই পদ্ধতির নাম শুনেই মনে হয় যে, এখানে মাথা খাটাতে হবে। প্রশিক্ষণের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এটি একটি ব্যতিক্রমী, উদ্ভাবনধর্মী নতুন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সকল প্রশিক্ষণার্থী তাদের নিজস্ব চিন্তা-শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পান। নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বাধীনভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং তা প্রকাশের সুযোগ থাকার কারণে প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণে সক্রিয় হন। কোনো বিশেষ বিষয়, সমস্যার বিশ্লেষণ বা সমাধান বের করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। এই পদ্ধতির উল্লে-খযোগ্য বিষয় হলো, কোনো বিষয় বড় দলে আলোচনা করার জন্য দেয়া হলে, যে যা বলে তা-ই বোর্ডে লিপিবদ্ধ করতে হয় এবং সেগুলো উপস্থাপন করতে হয়। অতপর বড় দলে আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

স্লাইড/ফ্লিপশিট ব্যবহার

আলোচনার বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সঠিক ধারণা দেয়ার জন্য পরিবেশ ও সুযোগ বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনে অধিবেশনে লিখিত স্লাইড/ফ্লিপশিট ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এখানে সহায়ক/প্রশিক্ষক পরিবেশ সুযোগ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে মাল্টিমিডিয়া বা ওভারহেড প্রজেক্টরের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করবেন।

প্রশিক্ষণ অধিবেশন পুনরালোচনা/পর্যালোচনা

প্রশিক্ষণ অধিবেশন পুনরালোচনা/পর্যালোচনা প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোকে কীভাবে ধারণ করতে পারছেন– অধিবেশন পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষক সে বিষয়ে পূর্ণ ধারণা পেতে পারেন। প্রশ্ন উত্তর, প্রতিবার্তা গ্রহণ এবং মুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সাধারণত প্রশিক্ষণ অধিবেশন পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পর্যালোচনা প্রতিটি অধিবেশনের পরে করলেই ভালো হয়। পর্যালোচনাকালে যদি কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের বোঝার অস্পষ্টতা থেকে যায়, সহায়ক/প্রশিক্ষক তা পুনরায় বুঝিয়ে দেবেন।

৬. প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার

প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বাড়ানো এবং এতে বৈচিত্র্য আনার জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উপকরণ ব্যবহার করার সময় কিছু বিধিবিধান মেনে চলা অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে অধিবেশনে উপকরণ ব্যবহার করার সময় এই সকল নিয়ম মেনে চললে উপকরণসমূহকে যেমন অর্থবোধক করে তোলা যায়, তেমনি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে প্রশিক্ষণটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই ব্যবহারবিধি বিভিন্ন উপকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে বা হয়ে থাকে। এখানে উপকরণ ব্যবহার করার সাধারণ কিছু নিয়ম আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো সার্বিকভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো যেতে পারে।

- **বোধগম্যতা:** উপকরণ ব্যবহার করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, উপকরণটি যেন সবার জন্য বোধগম্য হয়। ভাষা ও শব্দের ব্যবহার, আকার, রং ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- **স্থান নির্বাচন:** উপকরণটি এমন স্থানে রাখতে হবে বা এমন জায়গা থেকে দেখাতে হবে, যেন সবাই ভালোভাবে তা দেখতে পারে। উপকরণের অবস্থান খুব বেশি দূরে কিংবা খুব বেশি কাছে হওয়া ঠিক নয়।
- **প্রস্তুতি:** উপকরণটি ব্যবহার করার সময় প্রশিক্ষক/সহায়কের মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার। বিশেষ করে কখন উপকরণটি ব্যবহার করতে হবে, কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সহায়ক/প্রশিক্ষকের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। যে কোনো কাজের জন্য সাধারণ জ্ঞানের (Common Sense) বিকল্প নেই। উপকরণ ব্যবহারের জন্য এই সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগানো হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

৭. প্রশিক্ষণ স্থান/কক্ষের পরিবেশ

প্রশিক্ষণ স্থান/কক্ষটি কোলাহলমুক্ত নিরিবিলি হতে হবে। প্রশিক্ষণ কক্ষে যথেষ্ট আলো-বাতাস আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণ কক্ষে বসার স্থান এমন হওয়া উচিত, যেখানে সকল অংশগ্রহণকারী একই ধরনের আসনে বসতে পারেন এবং সবাই সবাইকে দেখতে পান। এজন্য সহায়ক/প্রশিক্ষকের বসার ব্যবস্থা বা প্রশিক্ষণ স্থান সম্পর্কে পূর্ব থেকেই ধারণা রাখতে হবে। বসার জন্য সবচেয়ে প্রচলিত ও কার্যকর নমুনা হচ্ছে ইংরেজি অক্ষর ইউ (U) আকারে বসা। এতে একটি শিখন পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং সহায়ক/প্রশিক্ষক সকলের প্রতি সমানভাবে লক্ষ্য রাখতে পারেন।

৮. সহায়ক/প্রশিক্ষক

৫ দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনার জন্য দুই জন সার্বক্ষণিক সহায়ক/প্রশিক্ষকের প্রয়োজন হবে। একজন মূল সহায়ক/প্রশিক্ষক এবং অপরজন সহ-সহায়ক/প্রশিক্ষক হিসেবে ওরিয়েন্টেশনটি পরিচালনা করবেন। যারা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তারা এই প্রশিক্ষণের সহায়ক/প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

৯. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

এই প্রশিক্ষণটি দু'ভাবে মূল্যায়ন করা হবে: ১. মুড মিটার, ২. মূল্যায়ন ফরম্যাট।

মুড মিটার: অংশগ্রহণকারীদের দিনের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য মুড মিটার ব্যবহার করা হবে। (অধিবেশন ১-এর সহায়কের নোট-এ এর বিবরণ দেয়া হয়েছে)।

মূল্যায়ন ফরম্যাট: প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন ফরম্যাটের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানা যাবে, যার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন সবল ও দুর্বল দিক জানা সম্ভব হবে। এই মূল্যায়ন ফরম্যাট এই মডিউলের শেষে সংযোজন করা হলো। (পরিশিষ্টে দেয়া আছে)

১০. শিক্ষক/সহায়কের চেকলিস্ট

একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সহায়ক/প্রশিক্ষকের ব্যাপক প্রস্তুতি প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি শুধুমাত্র বস্তুগত বিষয় দ্বারাই সীমাবদ্ধ নয় বরং বলা যায় সহায়ক/প্রশিক্ষকের জ্ঞানগত, দক্ষতামূলক ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলীও এ প্রস্তুতির সাথে সম্পর্কিত। তাই বিষয়কে ভালোভাবে আত্মস্থ করে সেটিকে বাস্তবায়ন করার দক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রস্তুতিরই অংশবিশেষ। এছাড়া প্রশিক্ষণ ভালোভাবে পরিচালনার জন্য একটি চেকলিস্ট হাতের কাছে থাকা প্রয়োজন। নিম্নে সহায়ক/প্রশিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য একটি চেকলিস্ট-এর নমুনা দেয়া হলো। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফল ও কার্যকর করতে সহায়ক/প্রশিক্ষক প্রয়োজনে এর সাথে আরো বিষয় সংযোজন করতে পারেন।

- প্রশিক্ষণ সময়সূচি মেনে চলা
- প্রশিক্ষণ অধিবেশনে মনোযোগী থাকা
- আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা
- প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা
- পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা
- অন্যের মতামতকে সম্মান দেখানো
- অন্যকে বলার সুযোগ দেয়া
- পাশাপাশি কথা না বলা
- কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ না করা
- অধিবেশন চলাকালে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা
- কথা বলার আগে হাত তুলে প্রশিক্ষকের অনুমতি নেয়া

ছবি: ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

বস্তি এলাকায় দুর্যোগ সহনশীল জীবিকায়ন

সময়: ৫ দিন

অধিবেশন	বিষয়	পদ্ধতি	সময়
প্রথম দিন			
অধিবেশন ১ **উদ্বোধন ও সূচনা**	• উদ্বোধনী বক্তব্য • কর্মসূচি পরিচিতি • প্রশিক্ষণ নীতিমালা নির্ধারণ • প্রত্যাশা যাচাই	বক্তৃতা, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ	০৯.০০-১০.৩০
অধিবেশন ২ **বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি**	• বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রেক্ষাপট • দুর্যোগ ও জলবায়ুগত ঝুঁকি • অর্থনৈতিক অবস্থা: দারিদ্র্য • ঢাকা ও সিলেটের নগর-বস্তির জীবিকায়ন	বক্তৃতা, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা	১০.৩০- ০১টা
	• দুপুরের খাবার বিরতি		০১.০০ - ০২.০০
অধিবেশন ৩ **সহনশীল জীবিকায়ন**	• সহনশীল জীবিকায়ন কী? • সহনশীল জীবিকা বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা • সহনশীল জীবিকায়ন বিশ্লেষণের পূর্বে করণীয় • সহনশীল জীবিকায়ন বিশ্লেষণের স্থান, সময় ও অংশগ্রহণকারী নির্বাচন • সহনশীল জীবিকায়ন বিশ্লেষণের ফ্লোচার্ট /ধাপসমূহ	বক্তৃতা, বড় দলে আলোচনা, দলীয় আলোচনা ও প্লেনারি	০২.০০- ০৪.৩০
দিনের অধিবেশনসমূহ পর্যালোচনা		বড় দলে আলোচনা	০৪.৩০-৫.০০
দ্বিতীয় দিন			
পূর্ববর্তী দিনের অধিবেশনসমূহ পর্যালোচনা		দলীয় আলোচনা প্লেনারিতে উপস্থাপন	০৯.০০-৯.৩০
অধিবেশন ৪ **সহনশীল জীবিকায়নের লক্ষ্যে ঝুঁকি বিশ্লেষণ**	• ঝুঁকি শনাক্তকরণ এবং ঝুঁকির মূল্যায়ন • ঝুঁকি প্রশমন • ঝুঁকি মোকাবিলার পরিকল্পনা	বক্তৃতা, বড় দলে আলোচনা, দলীয় আলোচনা ও প্লেনারি	০৯.৩০-০১.০০
	• দুপুরের খাবার বিরতি		০১.০০ - ০২.০০
অধিবেশন ৫ **সহনশীল ও স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ব্যবসায় নির্বাচন**	• বাজার বিশ্লেষণ • প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ • আর্থিক বিশ্লেষণ • চাহিদা নিরূপণ • দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ।	বক্তৃতা, বড় দলে আলোচনা, দলীয় আলোচনা ও প্লেনারি	০২.০০- ০৪.৩০
দিনের অধিবেশনসমূহ পর্যালোচনা		বড় দলে আলোচনা	০৪.৩০-৫.০০

অধিবেশন	বিষয়	পদ্ধতি	সময়
তৃতীয় দিন			
পূর্ববর্তী দিনের অধিবেশনসমূহ পর্যালোচনা		দলীয় আলোচনা প্লেনারিতে উপস্থাপন	০৯.০০-৯.৩০
অধিবেশন ৬ **সহনশীল জীবিকায়ন পরিকল্পনা**	• জীবিকায়নে ভবিষ্যত পরিকল্পনার গুরুত্ব • জীবিকায়ন পরিকল্পনার মৌলিক উপকরণ • জীবিকায়ন কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি	বক্তৃতা, বড় দলে আলোচনা, দলীয় আলোচনা ও প্লেনারি	০৯.৩০-০১.০০
	• দুপুরের খাবার বিরতি		০১.০০ - ০২.০০
অধিবেশন ৭ **সহনশীল জীবিকায়নের লক্ষ্যে হিসাবরক্ষণ**	• হিসাব কি? • হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা • হিসাব লেখার কলাকৌশল	বক্তৃতা, বড় দলে আলোচনা, দলীয় আলোচনা ও প্লেনারি	০২.০০- ০৪.৩০
দিনের অধিবেশনসমূহ পর্যালোচনা		বড়ো দলে আলোচনা	০৪.৩০-৫.০০
চতুর্থ দিন			
পূর্ববর্তী দিনের অধিবেশনসমূহ পর্যালোচনা		দলীয় আলোচনা, প্লেনারিতে উপস্থাপন	০৯.০০-৯.৩০
অধিবেশন ৮ **সহনশীল জীবিকায়ন উন্নয়নের লক্ষ্যে নেতৃত্ব**	• নেতৃত্ব ও নেতৃত্বের ধরন • নেতৃত্বের নতুন ধারণা: প্যারাডাইম শিফট ইন লিডারশীপ • নেতৃত্বের ধরনের ক্ষেত্রে সেবক নেতৃত্ব • সেবক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি • নৈতিকতা ও নেতৃত্ব	বক্তৃতা, বড় দলে আলোচনা, দলীয় আলোচনা ও প্লেনারি	০৯.৩০-১২.০০
অধিবেশন ৯ **নগর-বস্তিতে জীবিকায়ন সরেজমিন বিশ্লেষণ**	• মাঠ পরিদর্শনের প্রস্তুতি	উদ্দেশ্য বর্ণনা, কার্যক্রম বর্ণনা, চেকলিস্ট পর্যালোচনা	১২.০০-০১.০০
	• দুপুরের খাবার বিরতি		০১.০০ - ০২.০০
	• মাঠ পরিদর্শন ও প্রতিবেদন উপস্থাপন	মাঠ পরিদর্শন, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন	০২.০০-০৫.০০
পূর্ববর্তী দিনের অধিবেশনসমূহ পর্যালোচনা		দলীয় আলোচনা, প্লেনারিতে উপস্থাপন	০৯.০০-৯.৩০

অধিবেশন	বিষয়	পদ্ধতি	সময়
অধিবেশন ১০ সহনশীল জীবিকায়নে অ্যাডভোকেসি	• অ্যাডভোকেসি ও অ্যাডভোকেসির প্রকারভেদ • অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা চক্র • দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অ্যাডভোকেসি করতে হলে করণীয় • অ্যাডভোকেসি প্রচারাভিযান বা ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা • সহযোগী সংগঠন চিহ্নিত করা ও এলায়েন্স গঠন	বক্তৃতা, বড় দলে আলোচনা, দলীয় আলোচনা ও প্লেনারি	০৯.০০-০১.০০
	• দুপুরের খাবার বিরতি		০১.০০ - ০২.০০
	• অ্যাডভোকেসি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি	বড় দলে আলোচনা, দলীয় আলোচনা ও প্লেনারি	০২.০০-০৩.০০
প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন		ব্যক্তিগত মূল্যায়ন	০৩.০০-০৩.৩০
	সমাপনী		

ছবি: ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

অধিবেশন

০১ উদ্বোধন ও কর্মসূচি পরিচিতি

আলোচ্য বিষয়বস্তু

১.১ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা
১.২ অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি ও প্রত্যাশা যাচাই
১.৩ প্রশিক্ষণ মডিউল পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি, প্রত্যাশা ও প্রশিক্ষণ মডিউল সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি

বক্তৃতা, আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উদ্দীপক খেলা।

উপকরণ

মাল্টিমিডিয়া, লিখিত পোস্টার পেপার, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, ভিপ কার্ড, মাস্কিং টেপ/ডক ক্লিপ।

সময়: ৩০ মিনিট।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

১.১. উদ্বোধন ও কর্মসূচি পরিচিতি: সময় ৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন।
- বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সকল অংশগ্রহণকারীদের অবগত করুন। এক্ষেত্রে সহায়ক তথ্য ১.১ এর সহযোগিতা নিন।

১.২. জড়তা বিমোচন: সময়: ১৫ মিনিট

- সৃজনশীল উদ্দীপক খেলার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের জড়তা মোচন করুন
- এই প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ কি কি বিষয়ে জানতে বা শিখতে আগ্রহী সে সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে শুনুন।

১.৩. প্রশিক্ষণ সম্পর্কীত আলোচনা: সময়: ১০ মিনিট

- অধিবেশন পরিকল্পনা অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশিক্ষণ অধিবেশন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে শিখন যাচাই এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন

০২ বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে জানবেন ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

১.১ ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ুগত ঝুঁকিতে বাংলাদেশের বড় শহর।
১.২ নগর দারিদ্র্য।

পদ্ধতি

বক্তৃতা, উন্মুক্ত চিন্তা, আলোচনা।

উপকরণ

মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, মাস্কিং টেপ/ডক ক্লিপ।

সময় : ২ ঘণ্টা।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া :

আলোচ্য বিষয়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৭.১	• অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন। • আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে 'ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ুগত ঝুঁকিতে বাংলাদেশের বড়ো শহর'– এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনার আহ্বান জানান। তাদের আলোচনার প্রধান পয়েন্টসমূহ বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। • পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে (সহায়ক তথ্য ১.১ অনুযায়ী) ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ুগত ঝুঁকিতে বাংলাদেশের বড় শহর এ বিষয়ে আলোচনা করুন। নগর ঝুঁকি বিষয়ক নির্ধারিত ভিডিও ও স্থিরচিত্র প্রদর্শন করুন। • আবারও অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন, কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর বুঝিয়ে বলুন।	৬০ মিনিট
৭.২	• অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে 'নগর দারিদ্র্য' বিশেষত বস্তিকেন্দ্রিক নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে আলোচনার আহ্বান জানান। তাদের আলোচনার প্রধান পয়েন্টসমূহ বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। • পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে (সহায়ক তথ্য ১.১ অনুযায়ী) নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। নগর ঝুঁকি বিষয়ক নির্ধারিত ভিডিও ও স্থিরচিত্র প্রদর্শন করুন। • এই প্রকল্পের আওতায় 'ঢাকা ও সিলেটের বস্তিকেন্দ্রিক দুর্যোগ সহনশীল জীবিকায়ন' শীর্ষক গবেষণায় যে তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া গিয়েছে, পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে সে-সম্পর্কিত গ্রাফসমূহ প্রদর্শন করুন। • অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন আছে কিনা জানতে চান। থাকলে তার উত্তর বুঝিয়ে বলুন। • আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে শিখন যাচাই করুন। ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।	৬০ মিনিট

পাঠ সহায়ক ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ুগত ঝুঁকিতে বাংলাদেশের বড় শহর

বাংলাদেশে নগরায়ণের হার বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ এবং এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করবেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কর্মহীনতা, স্বল্প আয় ও দরিদ্রতার কারণে দেশের শহরগুলোতে গ্রামীণ মানুষের অভিবাসন দ্রুত এবং ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অভিবাসনের উচ্চহার নগর জনসংখ্যা এবং ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরগুলোতে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধির জন্যও দায়ী, এই সংখ্যাটি ৭০ শতাংশেরও বেশি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে এটি ২.৫ শতাংশের বেশি নগরায়ণের হার সহ দ্রুত বর্ধমান শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় শহরগুলো রয়েছে। তবে দেশের নগরায়ণ মূলত ছয়টি বড় শহরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং শহুরে জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের বেশি এই শহরগুলোতে বাস করে।

রাজধানী ঢাকা দেশের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিল্প, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল। এই মেগাসিটিসহ খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ক্ষেত্রে বিপদাপন্ন বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে বেশিরভাগ বড় শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২-৩ মিটার থেকে ৬-৮ মিটার উচ্চতায় রয়েছে। ঢাকা শহর কয়েকটি পারস্পরিক নদী ও খাল দ্বারা আবদ্ধ, সিলেট শহরও নদী, টিলা ও ঝরনা দ্বারা প্রভাবিত। অনিয়ন্ত্রিত এবং অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ণ শহরগুলোর পরিবেশের অবক্ষয় ও দুর্যোগ ঝুঁকি বাড়ানোর জন্য দায়ী।

বাংলাদেশের উপকূলীয় জমিগুলোর গড় উচ্চতা সমুদ্র স্তর (এমএসএল) এর উপরে ১.৫ মিটারেরও কম। ইউএনএফসিসি অনুসারে (২০০৭) সমুদ্র স্তর যদি (এসএলআর) ১ মিটার বৃদ্ধি পায়, তবে বাংলাদেশের প্রায় ১৫ মিলিয়ন মানুষ বা মোট উপকূলীয় অঞ্চলের ১১% জনসংখ্যা এবং ১৭,০০০ কিলোমিটার বা আবাদি জমির ১৮% স্থায়ীভাবে সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। এই ক্ষয়ক্ষতির সাথে জড়িত মোট জনসংখ্যার ৬০% বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তদুপরি ১ মিটার ঝখজ (ঝবধ খবাবষ জরংব) এর ফলে ৮০০০ কিলোমিটার রাস্তা এবং দুটি বড়ো শহর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে (ইসলাম, ২০০১)। এই ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ জনগণের বাড়িঘর ও জমি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পাড়ি জমানোর বিকল্প নেই। যেখানে এই অঞ্চলগুলো বেঁচে রয়েছে সুপেয় পানির তীব্র সংকট এবং মূল বসতিগুলোতে দূষিত পানি সরবরাহের কারণে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে।

Islam, N. (2001). Urbanization, Migration and Development in Bangladesh: Recent Trends and Emerging Issues.

ঢাকা মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুটো দুর্যোগেরই মুখোমুখি যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যা, জলাবদ্ধতা, ভূমিকম্প-ঝুঁকি ও কালবৈশাখী ও টর্নেডো হলো রাজধানী শহরটির সাধারণ জলবায়ু ও ভূতাত্ত্বিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। অপরদিকে সিলেট শহর ভূমিকম্প-ঝুঁকি ও ভূমিক্ষয়, কালবৈশাখী ও টর্নেডো-ঝুঁকি কবলিত।

ঢাকায় বন্যা নদীর পানির অতিরিক্ত প্রবাহ ও বৃষ্টির পানির জলাবদ্ধতার সাথে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে বন্যার তীব্রতাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে দশবার ভারী বন্যা দেখা দিয়েছে এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ এবং ২০০৭ এর বন্যা বিপর্যয়কর ছিল। পুরো শহর এবং বিশেষত বস্তি অঞ্চলগুলো সেই বন্যায় আক্রান্ত হয়েছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকা বর্ষা মৌসুমে (মে-অক্টোবর) ব্যাপক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। এই বন্যার মূল কারণ শহরের সীমান্তবর্তী নদীসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস এবং নদীর পানি বৃদ্ধি ছাড়াও অভ্যন্তরীণ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও প্রবাহ-নিয়ন্ত্রণ কাঠামোগুলোর সমন্বিত পরিচালনার অভাব। দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং নগরীতে অনিয়ন্ত্রিত রিয়েল এস্টেট ব্যবস্থার উত্থান প্রাকৃতিক পানি নিষ্কাশন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রগুলোকে মারাত্মকভাবে বিনষ্ট করে দিয়েছে, যা পানির প্রাকৃতিক প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে এবং অতীতে প্রতি দশকে প্রায় প্রতি বছরই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে।

জনসংখ্যার উচ্চ বৃদ্ধি হার, অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন, অপরিকল্পিত ও প্রাকৃতিক জলনিষ্কাশন ব্যবস্থাবিরোধী ভূমি ব্যবহার বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উচ্চ-বৃষ্টিপাত পানি প্রবাহের পরিবর্তনের ধরন/প্যাটার্ন এর দরুন মানুষ ও জনবসতি স্থানান্তরিত হয়েছে। নদীগুলো তাদের প্রবাহ পরিবর্তন করেছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী আরও অনুকূল অঞ্চল চেয়েছে বলে জনবসতিগুলো জনবসতিপূর্ণ হওয়ার ঐতিহাসিক রেকর্ড রয়েছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব মিয়ানমার দ্বারা; পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব দিকে ভারত দ্বারা, এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর দ্বারা সীমানাযুক্ত। দেশটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার এক অনন্য সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। দেশের মোট আয়তনের ৮০ ভাগ নদী অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারত, নেপাল, ভুটান, চায়না ও বাংলাদেশের প্রায় ১৭.৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার নদী অববাহিকার বৃষ্টির পানি ও বরফগলা পানি এই ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। বিশ্বের অন্যতম প্রধান ২টি বৃহৎ নদী এবং ১টি অন্যতম প্রশস্ত নদী এবং অসংখ্য শাখা-প্রশাখা এই ভূখণ্ডের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। দেশের নদীগুলো প্রতি বছর ১৭ কোটি টন পলি এই ভূখণ্ডে অথবা বঙ্গোপসাগরে সঞ্চয় করে।

Image: https://saylordotorg.github.io

বাংলাদেশের ১,৪৩,৯৯৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার বেশির ভাগ অঞ্চল প্লাবন এবং নদ-নদীর পলল সঞ্চয়নের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এবং এখনো এই প্রক্রিয়া চলমান। দেশের সবকটি প্রধান ও মাঝারি নদী দ্রুত গতিপথ পরিবর্তন করছে। (মো. রেজাউল করিম, বাংলাদেশের দুর্যোগ, গতিধারা, ২০১৭, ঢাকা)

দুর্যোগের মাত্রা, ধরন ও পৌনঃপুনিকতায় পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের মাত্রা ও ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে, যার বিরূপ প্রভাব পড়বে আমাদের কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জীবন-জীবিকার ওপর। ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে স্বল্প সময়ে ভারী ও অধিক বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চট্টগ্রামে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২,৭৯৪ মি.মি. ও জুলাই মাসে ৭৩৭ মি.মি.। ২০০৭ সালে ১০ জুন রাত ১২টা থেকে ১১ জুন সকাল ৬টা পর্যন্ত (৩০ ঘণ্টায়) চট্টগ্রাম শহরে বৃষ্টিপাত হয়েছিল ৫০ মি.মি.। কিন্তু পরবর্তী ৮ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় ৩১৫ মি.মি.। অবিরাম ভারী বর্ষণে চট্টগ্রামে ভূমিধসে অন্তত ১২৭ জনের প্রাণহানি ঘটে। প্রবল বর্ষণের কারণে পাহাড় থেকে মাটি ও কাদার ঢল পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত কাঁচা ঘরবাড়ির ওপরে ধসে পড়লে বহু মানুষ চাপা পড়ে এবং নিখোঁজ হয়। বেশ কিছুদিন ধরে টানা বৃষ্টিপাত এই ঘটনার মূল কারণ। শহরের লেবুবাগান, বউবাজার, কুসুমবাগে মোট ১২৭ জনের প্রাণহানি ঘটে। তন্মধ্যে কুসুমবাগেই ১১৭ জনের মৃত্যু হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০০৭ সালের ভূমিধস ধ্বংসাত্মক ও প্রাণ-সংহারী ভূমিধস বলে বিবেচিত হয়।

দেশে বন্যা সংঘটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত শতাব্দীর শেষ ১৪ বছরে (১৯৮৭, ১৯৮৮ ও ১৯৯৮) তিনটি বড়ো বন্যা হয়, যার মধ্যে শেষ দুটি ছিল শতাব্দীর প্রবলতম। এ শতাব্দীতে ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৭-এ (২০০৭ সালে দুবার বন্যা হয়, জুলাই-আগস্ট ও সেপ্টেম্বর) ৫টি বন্যা হয়, যা আগের রেকর্ডের তুলনায় পুনঃপৌনিকতা। পার্বত্য এলাকায় ফ্লাশ ফ্লাড-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যাবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান পরিবর্তন। ২০০৭-এ 'সিডর', ২০০৮-এ (২ মে) 'নার্গিস', 'রেশমি' (২৭ অক্টোবর), ২০০৯-এ 'আইলা', ২০১২-এ 'মহাসেন' বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আঘাত করে। মাত্র ৬ বছরে ৫টি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত ইতঃপূর্বে আর সংঘটিত হয়নি।

গত দুই দশক ধরে হঠাৎ বন্যা (ফ্লাশ ফ্লাড) এবং ঘূর্ণিঝড়সহ চরম জলবায়ু ইভেন্টগুলো অভিযোজনজনিত অভিবাসনের হার এবং পরিমাণকে বৃদ্ধি করেছে। ২০০৯ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড় আইলা দ্বারা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ গ্রাম থেকে নগরাঞ্চলে অভিবাসী হয়েছিল। এই ঘূর্ণিঝড়ের ফলে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল, দুই লক্ষেরও বেশি মানুষ পানিতে আটকা পড়েছিল, ৩০০ এরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল এবং ১১২০ জন মানুষ ছিল নিখোঁজ (ভূমি, ২০১০)। এটি কেবল উদ্বেগের কারণ নয়, তবে এই লোকেরা তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর পরে তাদের চিকিৎসা এবং নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। অভিবাসী সম্প্রদায় তাদের উৎপত্তিস্থলে প্রাকৃতিক সমস্যা ও বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল, তবে শহুরে গন্তব্যে পৌঁছালেও এই জলবায়ু-বাস্তুচ্যুত অভিবাসীরা নানা রকম

বঞ্চনার একাধিক দিক অনুভব করে, যা তাদের জীবনযাত্রার একটি ভালো মানের অর্জনের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ, খুলনা এবং ঢাকার শহরের বস্তিতে বসবাসরত ৬৫ শতাংশের বেশি বাসিন্দাদের কোনোও স্যানিটেশন সুবিধা নেই, ৩৫ শতাংশ বস্তিবাসীর তাদের আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই, ৪৫ শতাংশ বস্তিবাসীর তাদের আবর্জনা সংগ্রহ ব্যবস্থার বাইরে রয়েছেন (সিইএস, ২০০৬)। চরম জলবায়ুর ঘটনা দ্বারা চালিত অভিবাসীদের এই ক্রমবর্ধমান প্রবাহ বিদ্যমান নগর ব্যবস্থার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় বন্যার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে হিমালয়ের বরফগলা পানিসহ উজানের নেপাল ও ভারতের বৃষ্টিপাতের পানি, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদী হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১০৯৪ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং প্রতি বছরই প্রায় ১৫ লক্ষ হেক্টর চাষের জমি বন্যা ও জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে। এদিকে পূর্বানুমান করা হয়েছে যে, শুধু বাংলাদেশেই ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০-১৫ ভাগ এবং ২০৭৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ তা প্রায় ২৭ ভাগ বেড়ে যাবে। এই বাড়তি পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে সমুদ্রে যাবার সময় সৃষ্টি করবে তীব্র বন্যা। এমনকি ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে বিগত ১৫ বছরের তুলনায় সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হলেও উত্তরাংশের সিলেট ও রাজশাহীতে বিগত ২ বছরের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় হাকালুকি হাওরসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিপুল পরিমাণ নিচু এলাকা প্রায় ৭ মাস ধরে প্লাবিত রয়ে যায়। এরকম ভয়াবহ বন্যায় কত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার ব্যাপারে বিভিন্ন উৎস থেকে আলাদা আলাদা উপাত্ত পাওয়া যায়। কারো মতে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বন্যায় উদ্বাস্তু হবে প্রায় ৭ কোটি মানুষ। উদ্বেগের বিষয় হলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং (ওডগ)-এর গবেষণা মতে, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের বন্যার পর দেশে বন্যাপ্রবণ এলাকার পরিমাণ ১৮ শতাংশ বেড়েছে এবং বর্তমানে উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের ৩৪টি শহর বন্যার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তথ্যসূত্র: নিজস্ব প্রতিবেদক (নভেম্বর ১৮, ২০০৯)। "গবেষণা ফলাফলে নতুন তথ্য প্রকাশ: উপকূলীয় অবকাঠামো জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়।" দৈনিক প্রথম আলো। ঢাকা।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালে ১২.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। ১৯৯১ সালের ৪৪.২ শতাংশ থেকে দারিদ্র্যের এই হার ২০১০ সালে ১৮.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ তার দারিদ্র্যের হার কমাতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করছে এবং বিশ্বব্যাংকের মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের বড় সুযোগ রয়েছে। *(Bangladesh's extreme poverty rate drops to 12.9 percent, says World Bank, https://bdnews24.com/economy/2016/10/03/bangladesh-s-extreme-poverty-rate-drops-to-12.9-percent-says-world-bank)*

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ সরকার 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী' (ঝড়পরধষ ঝধভবঃু ঘবঃ) কর্মসূচির আওতায় আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করে। 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী' কর্মসূচির আওতায় সরকার ২১টি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও বৃদ্ধ ভাতা অন্যতম।

তবে 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী' কর্মসূচির আওতায় নগর দরিদ্রদের জন্য কোনো সুবিধা চালু নাই।

নগর দারিদ্র্য

বাংলাদেশের দ্রুত নগরায়ণ ১৯৮০ এর দশকে শুরু হয়েছিল। নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় ধারাবাহিকভাবেই বেড়েছে, যা ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বার্ষিক ছয় শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা ধারাবাহিকভাবে ৩.৫ শতাংশ হারে প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে (ইসলাম এবং আল ১৯৯৭, সিইউএস এটি ২০০৬)। ২০০৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে নগরায়ণের স্তরটি ২৫ শতাংশে পৌঁছেছিল। ধারণা করা হচ্ছে যে, উচ্চ হারের এই বৃদ্ধি তিন থেকে চার দশকের মধ্যে জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে পুরো দেশ একটি নগরায়িত দেশ হয়ে উঠবে (ইসলাম ২০০৬)। এই রাজধানী শহর ঢাকা সিংহভাগ বৃদ্ধি ও উন্নয়ন দেখেছে, এবং ২০০১ সালের মধ্যে বিশ্বের ১০টি মেগাসিটির মধ্যে স্থান দখল করে নিয়েছে (লুইস ২০১১)। সাম্প্রতিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে আনুমানিক ২০ মিলিয়ন (UN-Habitat 2007) জনসংখ্যা নিয়ে মেগাসিটিতে উন্নীত হবে, অপরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সাথে নিয়েই।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ২০১৬ সালের খানা ব্যয় ও আয় জরিপের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের পরিসংখ্যান তৈরি করেছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, দৈনিক আয় যদি ১ ডলার ৯০ সেন্ট এর নিচে হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে দরিদ্র হিসেবে ধরা হয়। সরকারি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০১০ সালে দেশে হতদরিদ্র ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫৮ লাখ। ২০১৯ সালের জুন মাস শেষে অতি গরিব বা হতদরিদ্র ব্যক্তির সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৬০ লাখের কিছুটা বেশি। দেশের দারিদ্র্য হার সাড়ে ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০১৮ সালের জুন মাস শেষে এই হার ছিল ২১ দশমিক ৮ শতাংশ। এ দিকে গত জুন শেষে অতিদারিদ্র্য হার নেমেছে সাড়ে ১০ শতাংশে। ("দারিদ্র্য হার ২০ শতাংশে নেমেছে", *https://www.prothomalo.com/business/18,December.2019)*

দেশের বেশিরভাগ বস্তি ছোট, বড় শহরগুলোতে বস্তির সংখ্যা কম হলেও অভিবাসীর সংখ্যা অনেক বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপ অনুযায়ী, ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি ১০ লাখ ৬২ হাজার ২৮৪ জন লোক বস্তিতে বাস করেন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম, এ বিভাগে বস্তিবাসীর সংখ্যা ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯১৬ জন। এছাড়া খুলনায় এক লাখ ৭২ হাজার ২১৯ জন, রাজশাহীতে এক লাখ ২০ হাজার ৩৬ জন, রংপুরে এক লাখ ১৮ হাজার ৬২৮ জন, সিলেট বিভাগে ৯১ হাজার ৬৩০ জন এবং বরিশাল বিভাগে ৪৯ হাজার ৪০১ জন বস্তিতে বাস করেন। ("রাজধানীর ৩৩৯৪ বস্তিতে বাসিন্দা সাড়ে ৬ লাখ", https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1633714.bdnews)

জলবায়ু অভিবাসন

লবণপানি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলকে ধীরে ধীরে গ্রাস করায় সেখানকার মানুষ শুধু কাজ হারিয়ে উদ্বাস্তু হচ্ছে। তাঁরা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতেও পড়ছেন। বিশেষ করে নারীদের এই ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার-এর হিসেব অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গত ছয় বছরে বাংলাদেশের ৫৭ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়েছেন। ঢাকার বস্তি এলাকায় বসবাসকারীদের প্রায় ৭০ শতাংশই পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে স্থানান্তরিত বলে জানিয়েছে অভিবাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা–আইএমও। দক্ষিণে খুলনার কয়রা, দাকোপ ও পাইকগাছা, বাগেরহাটের মংলা ও শরণখোলা, সাতক্ষীরার আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলাসহ সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকার প্রায় ২ লাখ নারী ও কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার-এর হিসেব অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গত ছ'বছরে বাংলাদেশের ৫৭ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়েছেন। ("বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তু",https://www.dw.com/bn.)

অভিবাসনের ফলাফল

ঢাকার বস্তি এলাকায় বসবাসকারীদের প্রায় ৭০ শতাংশই পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে স্থানান্তরিত বলে জানিয়েছে অভিবাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএমও। যাঁরা আবাসস্থল ছেড়ে অন্যস্থানে চলে যেতে বাধ্য হন, তাঁরাই উদ্বাস্তু। এই উদ্বাস্তু অবস্থা দেশ ছেড়ে অন্যদেশে গেলেই যে হবে, তা নয়। দেশের ভেতরে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে গেলেও তিনি উদ্বাস্তু। বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তু ক্রমেই বাড়ছে।

- বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তু শুধু দেশের ভেতরে এক জেলা থেকে আরেক জেলায় নয়, বিদেশেও পাড়ি জমাচ্ছেন। বিদেশে যাঁরা কাজের সন্ধানে যাচ্ছেন, তাঁদের প্রথম গন্তব্য প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য। মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রতারিত, অনেকে নির্যাতিত হয়েও দেশে ফিরছেন।
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাইরে শহরের বস্তিতে এক বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস। এরা নানাবিধ অস্থায়ী কর্মকাণ্ডে শ্রম বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ করে। এদের বাসস্থানের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। তাদের খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, পানি, বিদ্যুৎ সুবিধা একেবারেই অপ্রতুল। জলবায়ু পরিবর্তন এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসী মানুষ ঢাকাসহ বড় বড় শহরের বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করছে। ফলে বস্তির জনসংখ্যা বাড়ছে। বস্তিতে আগমনকারী জলবায়ু উদ্বাস্তুগণ নগর দুর্যোগ সম্পর্কে অবহিত নন। ফলে তাঁদের পক্ষে নগর দুর্যোগের সাথে খাপ খাওয়ানো, মোকাবিলা করা ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব। নগর দুর্যোগ তাদের কর্মহীনতা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহানির বড় কারণ।

বাংলাদেশে নগর দুর্যোগ

অতিবৃষ্টি

ইন্টার-গভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে স্বল্প সময়ে ভারী ও অধিক বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চট্টগ্রামে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২,৭৯৪ মি.মি. ও জুলাই মাসে ৭৩৭ মি.মি.। ২০০৭ সালে ১০ জুন রাত ১২টা থেকে ১১ জুন সকাল ৬টা পর্যন্ত (৩০ ঘণ্টায়) চট্টগ্রাম শহরে বৃষ্টিপাত হয়েছিল ৫০ মি.মি.। পরবর্তী ৮ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় ৩১৫ মি.মি.। অবিরাম ভারী বর্ষণে চট্টগ্রামে ভূমিধসে অন্তত ১২৭ জনের প্রাণহানি ঘটে। শহরের লেবুবাগান, বউবাজার, কুসুমবাগে মোট ১২৭ জনের প্রাণহানি ঘটে। তন্মধ্যে কুসুমবাগেই ১১৭ জনের মৃত্যু হয়।

অগ্নিকাণ্ড

নিকট অতীতে অগ্নিকাণ্ড প্রধানত গ্রামীণ বাড়ি-ঘরে, কখনোবা শহরের বাড়ি-ঘরে সংঘটিত দুর্ঘটনা হিসেবে পরিগণিত হতো। হাট-বাজারেও কদাচিৎ অগ্নি দুর্ঘটনা সংঘটিত হতো। রাতের বেলায় কেরোসিনের কুপিবাতি থেকে, শীতকালে শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে উত্তাপ গ্রহণের সময়, কিংবা শুকনো পাতা ও ডালপালায় আগুন ধরিয়ে বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার করার সময় সৃষ্ট আগুন অগ্নিকাণ্ডের প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হতো। সাম্প্রতিককালে শিল্প-কারখানা, বিশেষত পোশাক শিল্প-কারখানায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের দরুন জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ছড়িয়ে পড়ছে। ২০১২ সালে ঢাকার কাছে তাজরিন গার্মেন্টসে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে ১১৬ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন। অগ্নিকাণ্ডের কারণে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে শিল্পখাত, বিশেষত গার্মেন্টস শিল্পে সবচেয়ে মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তাজরিন ট্রাজেডি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কারখানা আইন ভঙ্গ করে নিচতলায় প্রবেশ পথে কাপড়ের গুদামের অবস্থান, আগুন লাগার প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে শ্রমিকদের কাজ চালিয়ে যেতে বলা ও তাদেরকে নিরাপদ স্থানে বের-হয়ে-আসার পথে বাধার সৃষ্টি, জরুরি নির্গমন পথ সচল না করা–এ সবই প্রমাণ করে শিল্প-কারখানায় অগ্নিকাণ্ড দুর্ঘটনা নয়, বরং তা মানুষের অবহেলাজনিত দুর্যোগ।

ভবনধস

বাংলাদেশে ভবনধসের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবনধসের কারণে এমন মাত্রায় ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, যা দুর্যোগের সম-পর্যায়ভুক্ত। নিম্ন প্লাবন সমভূমি বা জলাভূমি ভরাট করে বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ, ত্রুটিপূর্ণ নকশা, নকশা-বহির্ভূত ভবন সম্প্রসারণ ও নিম্নমানের নির্মাণ-সামগ্রী ব্যবহার করে ভবন নির্মাণই সাম্প্রতিককালে সংঘটিত ভবনধসের মূল কারণ। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত বড় শহরে অনেক ক্ষেত্রেই বহু আকাশচুম্বী ভবন 'ইমারত নির্মাণ বিধিমালা' ও 'বিল্ডিং কোড' অনুসরণ না করেই নির্মিত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সংখ্যক তলার চেয়ে বেশি তলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ভূপ্রাকৃতিক এবং ভূতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত বিবেচনা না করেই ঢাকা নগরীর সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। প্রকৌশল নিয়ম অনুসরণ না করে জলাভূমি ভরাট করে আবাসিক এলাকা ও শিল্প এলাকা গড়ে তোলা হচ্ছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, নিম্ন-প্লাবন সমভূমি ও ভরাটকৃত জলাভূমি বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের উপযোগী নয়। জমির স্বল্পতা ও উচ্চমূল্যের কারণে এই প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে, ফলে ভবনধসের ন্যায় মানবসৃষ্ট দুর্যোগ আর হবে না এমনটি বলা যায় না।

২০১০ সালের ১ জুন ঢাকার মধ্য বেগুনবাড়িতে ঝিলের প্রান্তে পাঁচতলাবিশিষ্ট নির্মাণাধীন একটি ভবন কাত হয়ে পার্শ্ববর্তী ৪টি টিনশেড ঘরের ওপরে পড়লে উক্ত ঘরসমূহে বসবাসরত ২৫ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ১,১৩৫ জন মানুষ নিহত হন এবং ২,৫০০ জনেরও বেশি আহত হন। এদের মধ্যে ২,৪৩৭ জনকে মৃত ও আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।**

উৎস: Daniel M.S. and Afsana T. (2013)

* বার্ষিক দুর্যোগ প্রতিবেদন ১৯৯৭, ডিজাস্টার ফোরাম

** দুর্যোগ প্রতিবেদন ২০১৩, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

জলাবদ্ধতা

স্বল্প জায়গায় অত্যন্ত ঘন জনবসতি ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনার মত বড় শহরের নগরের অধিবাসীদের জন্য বিভিন্ন দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে বর্ষায় জলাবদ্ধতা অন্যতম। বর্তমানে শহরাঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকায় দীর্ঘমেয়াদি জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর মাত্রা এতটাই প্রকট যে, তা দুর্যোগ হিসেবে পরিগণিত হয়। ৮০'র দশক থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা সাংবার্ষিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। নগরের জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ মৌসুমি বৃষ্টিপাতের সময় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য যে প্রকৌশল ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন তা নেই। নগরের বড় খালগুলো ভরাট করে বাড়ি-ঘর, দোকানপাট নির্মাণ করা হয়েছে। এখনো যে সরু কিছু খাল রয়েছে, প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় সেখানেও বস্তি কিংবা দোকানপাট নির্মাণ করে দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের মানুষকে ভাড়া দেয়া হয়েছে। কোথাওবা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ খাল-নালার পার্শ্ববর্তী জায়গায় ঘর নির্মাণ করে বসবাস কিংবা দোকানপাট নির্মাণ করে ব্যবসা করার জন্য দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের মানুষের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এভাবেই ঢাকা নগরের পানি নিষ্কাশনের অন্যতম প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ধোলাই খাল ইতিহাসের বইয়ে জায়গা করে নিয়েছে, বাস্তবে এর অস্তিত্ব নেই। নগরে জলাবদ্ধতার আরেকটি অন্যতম কারণ হচ্ছে অপর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা। নগর জলাবদ্ধতার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হলেও নগরের অধিবাসীবৃন্দও এই দায় থেকে মুক্ত নয়। আবাসিক বাড়ি-ঘরের গৃহস্থালি আবর্জনা, নির্মাণকাজের অবশিষ্টাংশ, বাজার ও দোকানপাটের বর্জ্য নগরবাসী অবাধে নিষ্কাশন ব্যবস্থায় নিক্ষেপ করে। এর ফলে নিষ্কাশন ব্যবস্থার নালা সরু কিংবা বন্ধ হয়ে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে অক্ষম হয়ে পড়ে, ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় জলাবদ্ধতা।

ভূমিকম্প

বাংলাদেশ উচ্চ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, উত্তর-পূর্বে শিলং মালভূমি, দক্ষিণ-পূর্বে বার্মিজ পর্বতমালা ও আরাকান ইয়োমা অ্যান্টিক্লাইনোরিয়াম অঞ্চল (ধনুকাকৃতির ভূ-অঞ্চল)। এছাড়া উত্তর-পূর্ব দিকে নাগা-দিসাং-জাফলং শক্তিশালী ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। এটি 'ডাওকি ফল্ট' নামে পরিচিত, যার সাথে সংযুক্ত রয়েছে অসংখ্য উপতলীয় সক্রিয় বিচ্যুতি ও নমনীয় অঞ্চল, যা 'সন্ধি অঞ্চল' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের টেকটোনিক মানচিত্রে দেখা যায় যে, উপকেন্দ্রগুলোর অবস্থান ডাওকি ফল্টের সাথে সম্পৃক্ত। বিগত ২০০ বছরে সাতটি প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প বাংলাদেশকে আঘাত করেছে। তবে উপরোক্ত সাতটির মধ্যে দুটি ভূমিকম্পের (১৮৮৫, ১৯১৮) উপকেন্দ্র দেশের অভ্যন্তরেই ছিল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ইন্ডিয়ান প্লেট-এর উত্তর-পূর্ব কোণে, যা মূলত ইন্ডিয়ান প্লেট, ইউরেশিয়ান প্লেট ও বার্মিজ উপ-প্লেট-এর সংযোগস্থল। প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প প্লেট বাউন্ডারি থেকেই উদ্ভূত হয়। সুতরাং বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ও টেকটোনিক অবস্থান জটিল। এই জটিল ভূতাত্ত্বিক ও টেকটোনিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের ভূমিকম্প-ঝুঁকি অনেক বেশি।

১৮৯৭ সালে সংঘটিত ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রটি ছিল ভারতের শিলং মালভূমি। উক্ত ভূমিকম্পে বড় পরিসরে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। অন্য যে দুটি ভূমিকম্প উপকেন্দ্রের আশেপাশের এলাকায় মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়–সেগুলো ছিল ১৮৮৫ সালে সংঘটিত 'বেঙ্গল ভূমিকম্প' এবং অন্যটি ১৯১৮ সালে 'শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প'। 'মধুপুর ফল্ট' মধুপুর গড়ের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিমে ১৫০ কি.মি. বিস্তৃত এই ফল্ট অত্যন্ত সক্রিয়। উভয় ফল্ট থেকেই ৭-এর অধিক মাত্রার ভূকম্পন উৎপত্তি লাভ করতে পারে। এই ফল্ট রাজধানী ঢাকার জন্য সর্বাধিক ভূমিকম্প ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ছবি: ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

অধিবেশন

০৩ দুর্যোগ-সহনশীল জীবিকায়ন

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে জানবেন ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

২.১ সহনশীল জীবিকায়ন ও এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে জানবেন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২.২ সহনশীল জীবিকায়ন বিশ্লেষণের ধাপসমূহ জানবেন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি
বক্তৃতা, উন্মুক্ত চিন্তা, আলোচনা।

উপকরণ
মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, মাস্কিং টেপ/ডক ক্লিপ।

সময় : ৯০ মিনিট।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া :

আলোচ্য বিষয়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৩.১	• অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন। • পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে (সহায়ক তথ্য ২.১ অনুযায়ী) সহনশীল জীবিকায়ন কী, কিভাবে করতে হয়, এর যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন। • এ সম্পর্কে তাদের মতামত শুনুন এবং প্রয়োজনে সেগুলো লিপিবদ্ধ করুন।	২০ মিনিট
৩.২	• পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে (সহায়ক তথ্য ২.২ অনুযায়ী) সহনশীল জীবিকায়ন বিশ্লেষণের ধাপসমূহ বর্ণনা করুন।	৬০ মিনিট
৩.৩	• পূর্বে করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করুন, প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য ৩.৩ এর সাহায্য নিন।	৫ মিনিট
৩.৪	• আলোচনার মাধ্যমে বিষয়সমূহের সারসংক্ষেপ করুন। • আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে শিখন যাচাই এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।	৬ মিনিট

পাঠ-সহায়ক রিজিলিয়েন্স (সহনশীলতা)

সহনশীল জনগোষ্ঠীর এমন এক সক্ষমতা যার দ্বারা ঐ জনগোষ্ঠী যে কোনো আপদের আঘাত প্রতিরোধ করতে পারে এবং আপদের প্রভাব দক্ষতার সাথে কাটিয়ে উঠতে পারে। এবং জরুরি মৌলিক কাঠামো ও কার্যক্রমসমূহ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করতে পারে।

Resilience means the ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of the hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures and functions **(UNISDR, 2009)**.

সহনশীল **জীবিকায়ন কি**

বিভিন্ন আপদ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষের জীবন-জীবিকা তথা আয়-রোজগার বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন পেশাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ-কারণে দুর্যোগ সহনশীল জীবিকায়নের পন্থা বেছে নেয়ার পূর্বে এলাকায় সংঘটিত হয় অথবা সম্ভাব্য আপদের সমন্বিত ও বিভিন্ন স্তরসমূহকে চিহ্নিত করতে হবে। সম্ভাব্য ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান চর্চাসমূহ এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যত সহনশীল জীবিকায়ন/পেশা বাছাই করা জরুরি।

সহনশীল **জীবিকায়ন কি স্থায়িত্বশীল?**

সহনশীল জীবিকায়ন স্থায়িত্বশীল কিনা এ প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে সহনশীলতার ধারণার মধ্যে। মূলত সহনশীল জীবিকায়ন স্থায়িত্বশীলতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। স্থায়িত্বশীলতার ধারণা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, 'স্থায়িত্বশীলতা' হচ্ছে এমন এক উন্নয়ন প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধি এমনভাবে নিশ্চিত করে যা পরিবেশ ও প্রতিবেশ (ইকোসিস্টেম)-এর জন্য ইতিবাচক। সুতরাং সহনশীল জীবিকায়ন একই সাথে স্থায়িত্বশীলও।

সহনশীল **জীবিকায়ন হচ্ছে উপার্জনের সেই সকল পন্থা– যে সকল পন্থায় (পেশায়) দুর্যোগের প্রভাব কম।**

সহনশীল **জীবিকায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে:**

১. স্থানিক দুর্যোগ বিবেচনা করে জীবিকায়নের পন্থা বাছাই

সহনশীল জীবিকায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জীবিকায়নের উপায় বা পেশাটি স্থানিক দুর্যোগের প্রেক্ষিত বিবেচনা করেই গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ পেশাটি এমনভাবে বাছাই করতে হবে যেন তা স্থানীয় দুর্যোগ দ্বারা ঘন ঘন আক্রান্ত না হয়, আক্রান্ত হলেও তা মোকাবিলার জ্ঞান, দক্ষতা ও উপকরণ থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, এখানে 'নগর দরিদ্র বসতি' (বস্তি) এলাকায় খুব নিচু স্থানে কোনো উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়, যা সহজেই নগর বন্যা বা জলাবদ্ধতায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

২. দুর্যোগ আক্রান্ত হলেও ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা আছে

যে কোনো জীবিকায়ন পন্থাই আকস্মিক দুর্যোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর দরুন উক্ত জীবিকায়ন পন্থা বা পেশা স্বল্প বা মাঝারি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সহনশীল জীবিকায় সেটিই যা এর স্বত্বাধিকারীর উক্ত দুর্যোগের আঘাতজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য যে জ্ঞান, দক্ষতা ও উপকরণ প্রয়োজন- অর্থাৎ সার্বিক সক্ষমতা রয়েছে। দুর্যোগের আঘাতজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য আর্থিক সঙ্গতিও তার থাকতে হবে। দুর্যোগের আঘাতজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য যে সময়টুকু প্রয়োজন সে সময়ে সে সাংসারিক ব্যয়ও তাকে মেটাতে হবে, এজন্য তার আর্থিক সঙ্গতি প্রয়োজন। সুতরাং সহনশীল জীবিকায়নের লক্ষ্যে তাকে:

- জীবিকায়ন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাস করতে হবে। ঝুঁকি প্রাকৃতিক আপদ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা অথবা ব্যবসায়ের মূলধন, উৎপাদন, কিংবা বাজারজাতকরণজনিত আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
- আপদের (ঐধুধৎফ) আঘাত মোকাবিলা করার লক্ষ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ডেঙ্গু জ্বর, কোভিড-১৯, সোয়াইন ফ্লু'র মত মহামারি/অতিমারি দেখা দিলে বিক্রি হ্রাস পাবে। উৎপাদনকারী নিজেও আক্রান্ত হতে পারে এসব অসুখে। সুতরাং প্রাকৃতিক বন্যা, জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টির সাথে মহামারির মত আপদ মোকাবিলার লক্ষ্যে আপৎকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

- জীবিকায়নের উপায়/পন্থা দুর্যোগ আক্রান্ত হলে তা মোকাবিলার জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও উপকরণ থাকতে হবে। ঢাকার বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড নিয়মিত ঘটনা। অগ্নিকাণ্ড জীবিকায়নের উপকরণ, এমনকি বসতঘরও ধ্বংস করে দেয়। আগুনের সূত্রপাতে প্রথম ২ মিনিটের মধ্যেই যদি তা নিভিয়ে ফেলা যায় তাহলে অগ্নিকাণ্ড ব্যাপকতা লাভ করে না। সুতরাং ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশার না হলেও বস্তিতে প্রতিটি ব্লকে এবং উৎপাদন কেন্দ্রে বালতিতে বালি ও পানি রাখা যেতে পারে। বস্তিতে যুবক ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'দুর্যোগ মোকাবিলা স্বেচ্ছাসেবী' দল প্রস্তুত করতে হবে। এছাড়া স্বল্প মাত্রায় হলেও যতটুকু পারা যায় প্রতিটি পরিবারেই কিছু সঞ্চয় থাকা প্রয়োজন।

৩. পরিবেশ-বান্ধব জীবিকায়ন

জীবিকায়নের এমন কিছু প্রায় প্রতিটি উপায় বা পন্থাই পরিবেশ সংশ্লিষ্ট। ভ্রাম্যমাণ সবজি বিক্রেতা, ফল বিক্রেতা, মুরগি বিক্রেতা সাধারণত তাঁদের ব্যবসায়ের উচ্ছিষ্ট বা গারবেজ শহরের স্যুয়ারেজ ড্রেনে ফেলে দেন। এর দরুন স্যুয়ারেজ ড্রেনের পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। এর দরুন নগরবাসী ভোগান্তির শিকার হয়। আবার বস্তির অভ্যন্তরে গৃহস্থালি ও উৎপাদনমুখী জীবিকায়নের (যেমন, খাদ্য প্রস্তুত) উচ্ছিষ্ট বা গারবেজ বস্তি-সংলগ্ন স্যুয়ারেজ ড্রেনে ফেলে দেন। এর দরুন বস্তিবাসীই সর্বাগ্রে জলাবদ্ধতার শিকার হয়। জলাবদ্ধতা দরিদ্র মানুষের জীবিকায়নে একটি বড় বাধা। সুতরাং জলাবদ্ধতা হয় এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে। গৃহস্থালি ও জীবিকায়নের উচ্ছিষ্ট নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। সেখান থেকে উচ্ছিষ্টসমূহ সিটি করপোরেশনের/পৌরসভার নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য বস্তির পেশাভিত্তিক দলসমূহ উদ্যোগ নিতে পারে।

৪. জেন্ডার-বান্ধব জীবিকায়ন

সহনশীল জীবিকায়নে নারীর মর্যাদাপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নারী জীবিকায়নে শুধু উৎপাদন ব্যবস্থায় কর্মী হিসেবে কাজ করবে না। তাকে তার কাজের মর্যাদা দিতে হবে, কর্মকালীন সুরক্ষা দিতে হবে, ন্যায্য মজুরি দিতে হবে। গৃহকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সে যেন লাভের অংশীদার হয় এবং নিজে অর্থ ব্যয় করার স্বাধীনতা ভোগ করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. অন্তর্ভুক্তি বা ইনক্লুশান (Inclusion)

সাধারণত কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সমাজের সকল শ্রেণির সমপরিমাণ মতামত, অংশগ্রহণ, সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ করাকে আমরা অন্তর্ভুক্তিকরণ বলে (ওহপষঁংরড়হ) বুঝে থাকি। যে কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সমাজের একেক স্তরের বা শ্রেণির মানুষের ওপর একেক ধরনের প্রভাব ফেলে। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে শুধুমাত্র শ্রমজীবী পুরুষ মানুষের অংশগ্রহণ যথেষ্ট হবে না, যদি না নারী-শিশু-বয়স্ক ব্যক্তিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ থাকে। কারণ, যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ব্যক্তিরা। অন্যদিকে সংখ্যালঘু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যে কোনো সম্মিলিত উদ্যোগের কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না, যার ফলে তারা দুর্যোগের সময় বা জরুরি প্রয়োজনে থাকেন উপেক্ষিত। সুতরাং নগর দরিদ্রদের বসতিতে (বস্তি) সহনশীল জীবিকায়নে নারী-শিশু-বয়স্ক ব্যক্তিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ তাদের শারীরিক ও মানসিক সুবিধা উপযোগী হতে হবে।

এই নির্দেশিকার বিভিন্ন পর্যায়ে বহুমুখী আপদ, বিপদাপন্নতা, ঋতুভিত্তিক জীবন-জীবিকার পঞ্জিকা ব্যবহার করে পেশা বাছাইয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সচ্ছল জীবন যাপনের জন্য জীবন-জীবিকার বর্তমান চর্চাসমূহ, সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতা এবং তা মোকাবিলা করে সহনশীল জীবিকায়ন/পেশা তথা জীবন-জীবিকার খাতসমূহ নির্ধারণ করা প্রয়োজন; যা জনগোষ্ঠী পর্যায়ে সহনশীল জীবিকায়ন নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রণীত সহনশীল জীবিকায়ন কর্ম-পরিকল্পনাকে সমৃদ্ধ করবে।

আপদ, বিপদাপন্নতা, ঋতুভিত্তিক জীবন-জীবিকার পঞ্জিকাভিত্তিক জীবিকায়ন বেছে নেয়ার পদ্ধতি পরিশিষ্ট ২-এ দ্রষ্টব্য

সহনশীল জীবিকায়ন কেন?

দুর্যোগ ও জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে জীবন ও সম্পদহানির পাশাপাশি আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র প্রান্তিক পরিবারগুলো পুরোপুরি অথবা আংশিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। গবেষণায় দেখা যায় যে, বস্তিতে বসবাসকারী যে-সকল মানুষ গার্মেন্টস কিংবা দোকানে কর্মী হিসেবে, এমনকি গৃহকর্মী হিসেবেও চাকরি করে তাদের আয় তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। কিন্তু অপরাপর পেশা যেমন, রিকশাচালনা, ফুটপাতে হকারি, ফেরিওয়ালা কিংবা উৎপাদনমুখী জীবিকা-নির্ভর যারা, তাদের আয় মারাত্মকভাবে কমে যায়। দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার সাথে সাথে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন হ্রাস পায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে, দারিদ্র্য বেড়ে যায়।

সরকার জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে অনেক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। তবে জীবিকার নিরাপত্তায় বেশির ভাগ পরিকল্পনা জাতীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়, যা পরে স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়। স্থানীয় সমস্যা ও সমাধান স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় জাতীয় পরিকল্পনা অনেক সময় স্থানীয় পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দিতে পারে না। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ও জলবায়ু সহনশীল জীবিকা বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি। স্থানীয় পরিকল্পনা সরকারের বিভিন্ন সেবাদানকারী বা সম্প্রসারণ কার্যক্রমের স্থানীয় অফিসের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন সম্ভব। তাই স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকিপূর্ণ বস্তিসমূহ চিহ্নিত করে সহনশীল জীবিকা বিশ্লেষণ করা ও একটি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। এ পরিকল্পনা সিটি করপোরেশন পর্যায়ে সমন্বয় করে ঐকমত্যের মাধ্যমে সিটি করপোরেশন, ওয়ার্ড কাউন্সিল, ইউনিসেফ, এনজিও ও অন্যান্য দপ্তরসমূহের মাধ্যমে তাদের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনায় প্রয়োজনে জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হলে তা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে বস্তিবাসীদের সহনশীল জীবিকায়নের সাথে সাথে জাতীয় পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকার অনিশ্চয়তা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

দুর্যোগের কারণে ঢাকা ও সিলেট উভয় নগরীর বস্তিবাসীদের জীবিকায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগে ঢাকার ৫০.৬% ও সিলেটের ৩০.২% (ফিগার ১) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। মূলত উৎপাদন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা হ্রাস, চলাচলে সমস্যা, নিচু এলাকা হওয়ায় উৎপাদন বন্ধ ও জলাবদ্ধতার কারণে জীবিকায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয় (ফিগার ২)। উভয় নগরীর বস্তিবাসীই তাদের জীবিকায়নের ঝুঁকি সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত (সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী সিলেটে ১০০% ও ঢাকায় ৯৫%), একই সাথে বিকল্প নিজেদের করণীয় ও ক্ষমতা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। উভয় নগরীর বস্তিবাসীই তাদের জীবিকায়নের ঝুঁকি হ্রাস ও সহনশীল জীবিকায়ন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব বলেও মনে করেন। সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকা ও সিলেটের বস্তিবাসী যে সকল পেশাকে সহনশীল জীবিকায়ন-ব্যবস্থা বলে মনে করেন তা নিম্নরূপ:

সহনশীল জীবিকায়ন-ব্যবস্থা	ঢাকা %	সিলেট%
ঘরের পাশে মাটি উঁচু করে বা টবে সবজি (লাউ, কুমড়া, করলা, পেঁপে) চাষ	২৩.৯	২৩.৮
বস্তির অভ্যন্তরে খাবার হোটেল	২০.৯	১৯
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ	১৬.৫	৬.৯
মোবাইল ফোন মেরামতের দোকান	১০	১১.৬
মোবাইল ফোনে টাকা রিচার্জ	৯.১	১০.৬
স্যানিটারি মেরামতি	২.৬	৯
বৈদ্যুতিক মেরামতি	৮.৩	৬.৩
হস্ত ও কুটির শিল্প	০	৭.৯
পার্লার কর্মী	০.৯	২.১
ফুটপাতভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়	৬.৫	১.৬

সহনশীল জীবিকায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যা করা প্রয়োজন বলে ঢাকা ও সিলেটের বস্তিবাসীগণ যা মনে করেন তা নিম্নরূপ:

কম ঝুঁকিপূর্ণ জীবিকায়ন	ঢাকা %	সিলেট%
পুঁজি সরবরাহ	৬০	৩৩.৩
পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ	৫০	১২
হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ	১৩.৫	৬.৮
উপাদনস্থলকে ঝুঁকিমুক্তকরণ	১.৪	৩.৪
স্বল্প মূল্যে উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ	২৫.৭	১৯.২
দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ব্যক্তিগত সরঞ্জামাদি	৮.১	১৮.৪

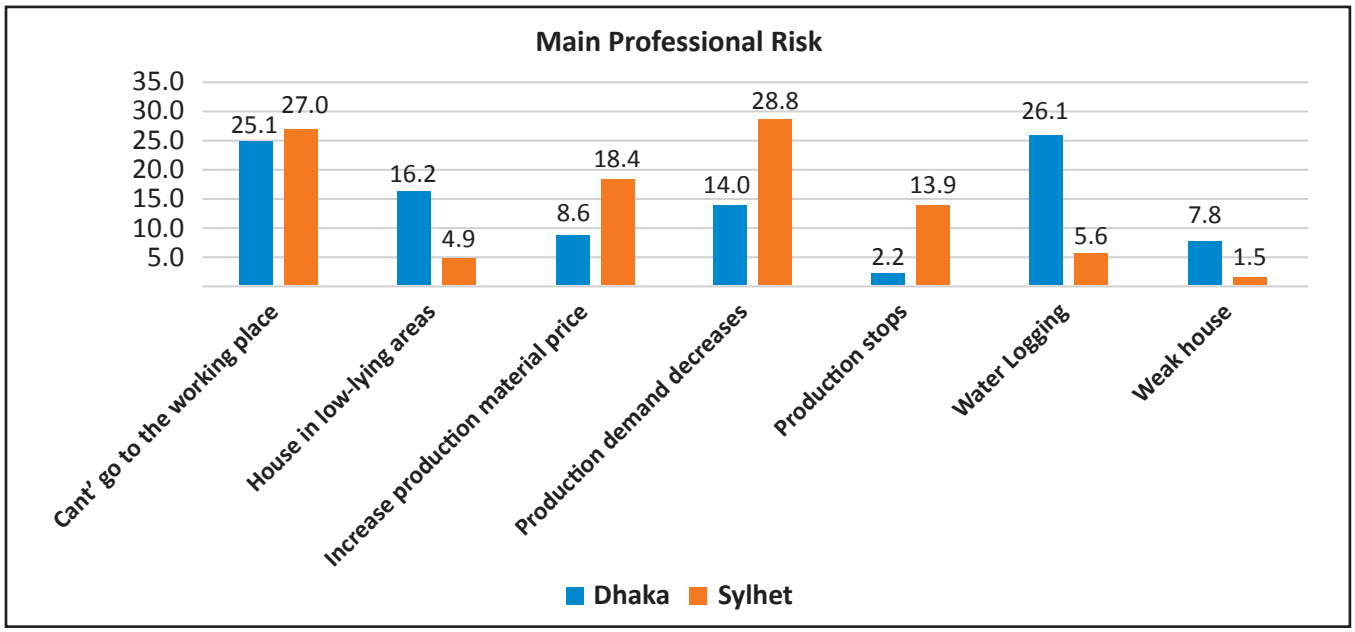

সমীক্ষা অনুযায়ী ঢাকা ও সিলেটে জীবিকায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রধান কারণসমূহ

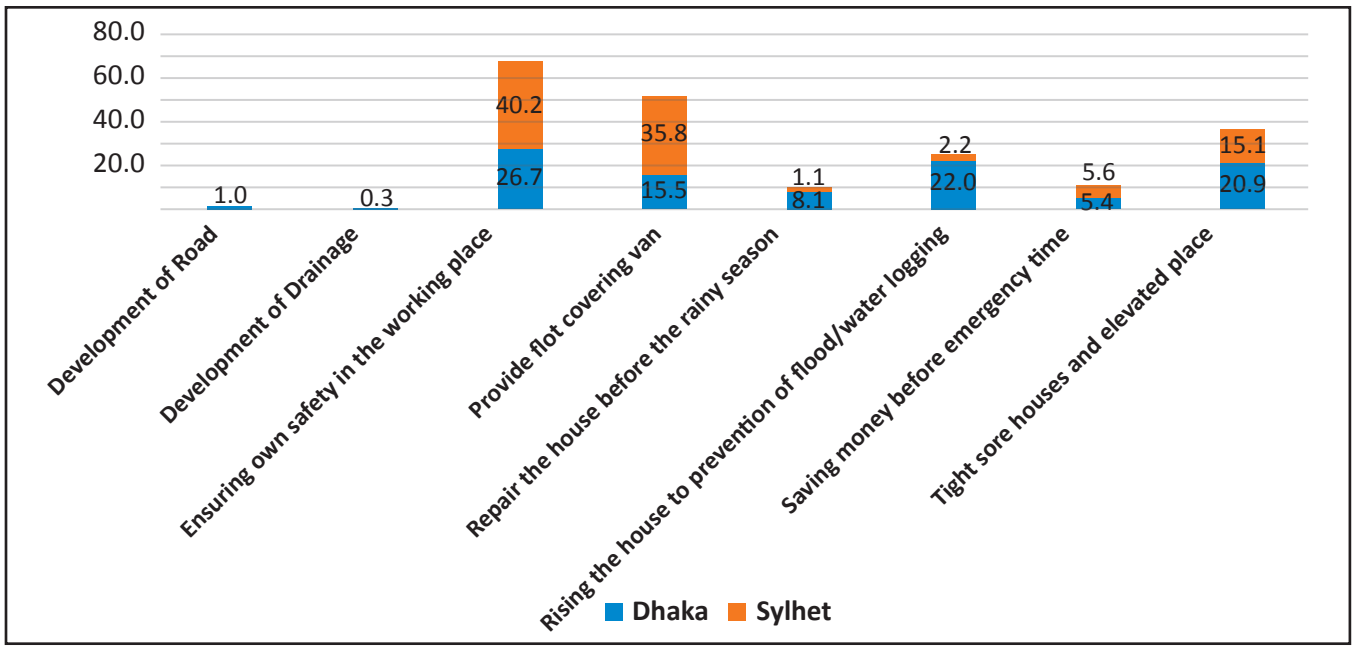

সমীক্ষা অনুযায়ী ঢাকা ও সিলেটে পেশাগত ঝুঁকি হ্রাস করার উপায়সমূহ

সহনশীল জীবিকায়নের লক্ষ্যে করণীয়

নগর বস্তির দরিদ্র মানুষের সহনশীল জীবিকায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

১. দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নির্বাচন

দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ বস্তি নির্ধারণ করতে হবে। এ জন্য সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় শহরের বস্তিগুলোতে 'নগর ঝুঁকি বিশ্লেষণ' (Urban Risk Assessment-URA) করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় নগরের বস্তিগুলোর ঝুঁকি বস্তিবাসীদের বিপদাপন্নতা নির্ধারণ করতে হবে। নগর ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বস্তিগুলোকে 'এ' 'বি' ও 'সি' ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে হবে। ধরা যাক, সূচকগুলোর অর্থ হবে নিম্নরূপ:

এ- সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ
বি- মধ্যম মাত্রার ঝুঁকিপূর্ণ
সি- নিম্ন মাত্রার ঝুঁকিপূর্ণ

২. ঝুঁকিগ্রস্ত জীবিকাভিত্তিক দল গঠন

বস্তিগুলোতে এবং একই বস্তির বিভিন্ন ব্লকে নির্বাচিত এলাকার জীবিকার ধরন ও বিপদাপন্নতার স্তর বিবেচনা করে দল গঠন করতে হবে। দলের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ বিশ জন হতে পারে, ক্ষুদ্র দল পাঁচজনকে নিয়েও হতে পারে। এ ধরনের দল হতে পারে উৎপাদনমুখী (খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রস্তুত) এবং অনুৎপাদনমুখী (ক্ষুদ্র ব্যবসায়, ফুটপাতভিত্তিক হকার, ফেরিওয়ালা, রিকশাচালক)। প্রয়োজনে মিশ্র দলও হতে পারে। মিশ্র দলে যে সমস্যা দেখা দিতে পারে তা হচ্ছে, সদস্যবৃন্দের সমস্যা, সমাধানের উপায় ও চাহিদা ভিন্ন হওয়ায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

৩. জীবিকাভিত্তিক দলসমূহের সহনশীল জীবিকায়ন বিশ্লেষণের উপর প্রশিক্ষণ

নির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক দলসমূহের জন্য প্রশিক্ষণ 'সহনশীল জীবকায়ন/পেশা উন্নয়ন' এর প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। বস্তিবাসীদের প্রশিক্ষণের সময় যে সকল বিষয়াদি বিবেচনা করতে হবে তা নিম্নরূপ:

- নিজ নিজ এলাকায় প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।
- প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের সময় নির্ধারণ করতে হবে।
- দৈনিক প্রশিক্ষণের সময় ৩ ঘণ্টার অধিক হবে না।
- প্রশিক্ষণ ব্যবহারিক সেশনভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- লেকচার পদ্ধতির পরিবর্তে ছবি, ভিডিওভিত্তিক ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ফলদায়ক হবে।
- ভাষাগত বোধগম্যতা বিবেচনা করতে হবে।

৪. পেশাভিত্তিক ঝুঁকি, ঝুঁকির কারণ ও প্রতিকারের জন্য পরিকল্পনা

প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা প্রশিক্ষিত সদস্যদেরকে সহনশীল জীবিকা বিশ্লেষণ বিষয়ে বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে কী কী সমস্যা হয় ও সমাধানে করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের প্রভাবে জীবিকায়নের পেশাসমূহ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ছক অনুযায়ী দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। দলীয় আলোচনায় একজন সহায়কের ভূমিকা একজন পোস্টার/বড়ো কাগজে লিখবে। পেশাভিত্তিক ঝুঁকি, ঝুঁকির কারণ ও প্রতিকারের জন্য পরিকল্পনা সিটি করপোরেশনের 'বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা বস্তিতে কর্মরত অন্যান্য এনজিওসমূহকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। পেশাভিত্তিক ঝুঁকি, ঝুঁকির কারণ ও প্রতিকারের জন্য পরিকল্পনা সিটি করপোরেশনের সরকারি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য উদ্যোক্তা এনজিওকে এ-ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৫. নগর বস্তির দরিদ্র মানুষের সহনশীল জীবিকায়নের লক্ষ্যে আইনি কাঠামো বিষয়ক অ্যাডভোকেসি

অ্যাডভোকেসি হচ্ছে এমন একটি পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যা প্রান্তিক ও অধিকারবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা পরিবর্তন ও সংস্কার করে অথবা এর বাস্তবায়নের পথ সুগম করে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক ও অধিকারবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট থাকা প্রয়োজন যা তাদের ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করে, তাদেরকে ভাবতে শেখায় যে তারা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অনুঘটক এবং তারাও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা চক্র অ্যাডভোকেসি পরিচালনা দলের জন্য এমনই এক দিক-নির্দেশনা যার মাধ্যমে তাঁরা খুঁজে পেতে পারেন অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের পুরো (step-by-step) রোড ম্যাপ। অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা চক্রকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; প্রাক-প্রস্তুতি, প্রস্তুতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

নগর বস্তির দরিদ্র মানুষের সহনশীল জীবিকায়নের লক্ষ্যে আইনি কাঠামো বিষয়ক অ্যাডভোকেসি করতে হবে। যেহেতু বস্তিবাসী অসংগঠিত এবং তাদের কোনো সংগঠনও নাই, সুতরাং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা তথা এনজিও বিভিন্ন ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ও বিভাগে অ্যাডভোকেসি করতে পারে। সম্ভাব্য দুটি মন্ত্রণালয় হতে পারে 'স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়' ও 'সমাজ সেবা মন্ত্রণালয়'। এক্ষত্রে সুনির্দিষ্ট অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা করতে হবে। এ-জন্য ইস্যু নির্বাচন, ইস্যু বিশ্লেষণ, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, টার্গেট অডিয়েন্স বা লক্ষ্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ, অ্যাডভোকেসি বার্তা তৈরি, সম্পদ নিরূপণ ও সমাবেশ, অ্যাডভোকেসি প্রচারণা কৌশল নির্ধারণ ও জোট গঠন করতে হবে।

ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশের রিজিলিয়েন্স-বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক

ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি জলবায়ু-বিপদাপন্ন পরিবার ও জনগোষ্ঠীসমূহের রিজিলিয়েন্স (বা বিপদাপন্নতা কাটিয়ে টিকে থাকার সক্ষমতা) বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের অভিযোজন-সক্ষমতা শক্তিশলীকরণে ও সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসকরণে ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ তাদের জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। যেমন: পরিবার, জনগোষ্ঠী, স্থানীয় সরকার ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে বিপদাপন্নতার পূর্বানুমান করতে পারে, বিপদাপন্ন হলে তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এবং জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতার সাথে খাপ খাওয়ানো, অভিঘাত মোকবিলা এবং তা থেকে নিজেদেরকে পুনরুদ্ধার করার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য তাদেরকে বিভিন্ন সহায়তা (আর্থিক ও কারিগরি) সহায়তা দিয়ে থাকে। আমরা জাতীয় ব্যবস্থাপনার সাথে স্থানীয় ব্যবস্থাপনাকে যুক্ত, সমন্বিত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কাজ করি। এই পরিকল্পনা জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার লক্ষ্যে গৃহীত অর্থ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহকে জলবায়ু পরিবর্তনের মুখোমুখি বাংলাদেশের সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তির কথা বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত হয় ।

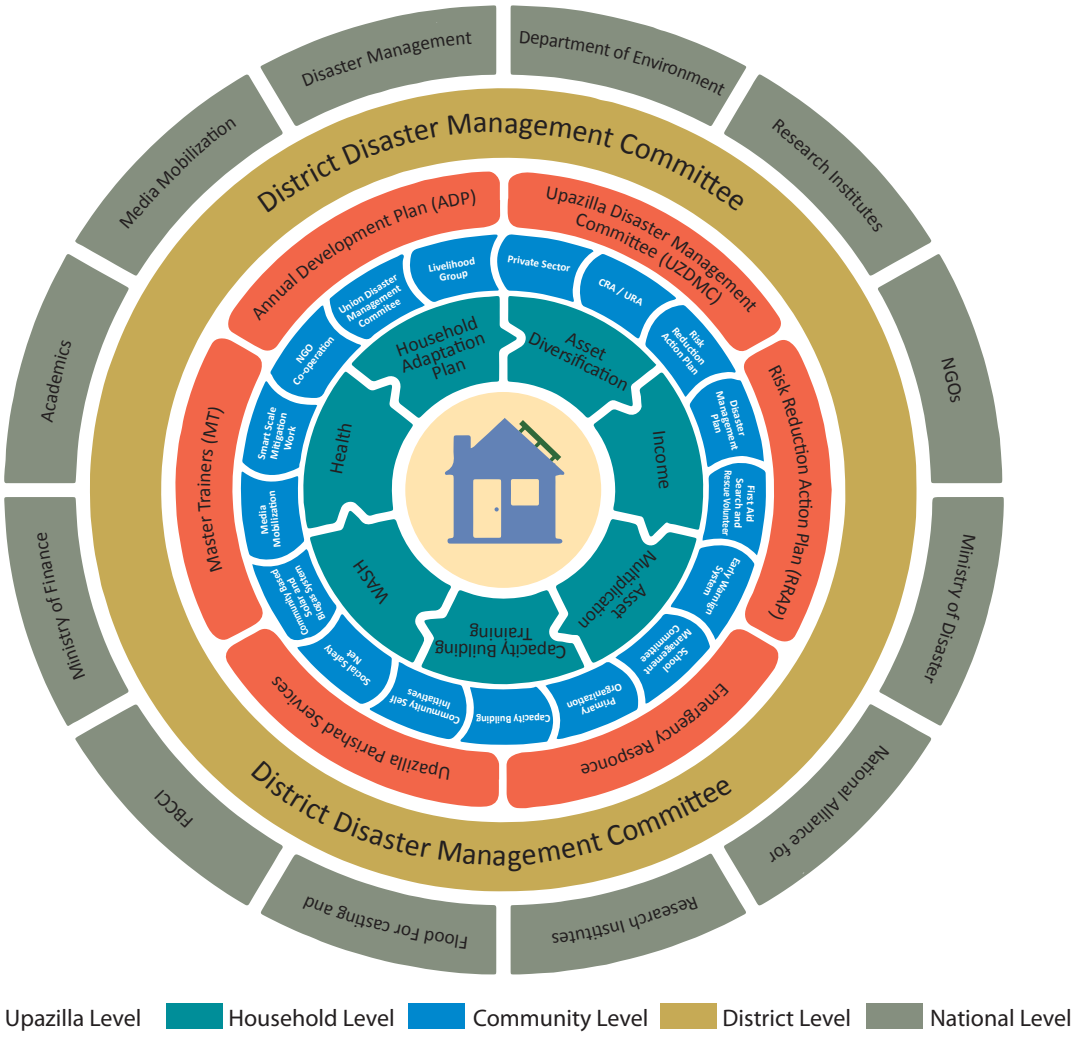

অধিবেশন

০৪ সহনশীল জীবিকায়নের ঝুঁকি

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে জানবেন ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

- ঝুঁকি শনাক্তকরণ ও ঝুঁকির মূল্যায়ন
- ঝুঁকি প্রশমন
- ঝুঁকি মোকাবিলার পরিকল্পনা

পদ্ধতি

বক্তৃতা, উন্মুক্ত চিন্তা, আলোচনা।

উপকরণ

মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, মাস্কিং টেপ/ডক ক্লিপ।

সময় : ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া :

আলোচ্য বিষয়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৩.১	• অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন। • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন– ব্যবসায় পরিচালনা করতে গিয়ে প্রতিদিন তারা কী ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হন। তাদের মতামতগুলো বোর্ডে লিখে রাখবেন। এরপর সহায়ক পূর্বে প্রস্তুতকৃত মাল্টি মিডিয়ায় তৈরিকৃত 'ব্যবসায়ের ঝুঁকি'সমূহ প্রদর্শন করবেন ও আলোচনা করবেন। সহায়ক পাঠ-সহায়কের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি (ঝুঁকি শনাক্তকরণ) সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের বলবেন। সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ঝুঁকিগুলোকে সাজাবেন। • এরপর সহায়ক তাদেরকে এসব ঝুঁকির কীভাবে মূল্যায়ন করতে হয় তা বলবেন। এরপর তিনি সহায়ক নোটের সাহায্যে ঝুঁকি মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে বলবেন।	৪৫ মিনিট
৩.২	• সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন তারা এখন কীভাবে ঝুঁকি প্রশমন পরিকল্পনা তৈরি করে থাকেন। এরপর তিনি সহায়ক নোটের সাহায্যে কীভাবে ঝুঁকি প্রশমন পরিকল্পনা তৈরি করতে হয় তা ব্যাখ্যা করবেন।	৬০ মিনিট
৩.৩	• পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে 'ঝুঁকি প্রশমন কর্ম-পরিকল্পনা' প্রণয়নের সম্পর্কে (সহায়ক তথ্য ৩.৩ অনুযায়ী আলোচনা করুন। অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করুন। অংশগ্রহণকারীদের ৩/৪টি দলে ভাগ করে 'ঝুঁকি প্রশমন কর্ম-পরিকল্পনা' প্রণয়নের জন্য বলুন (সময়: ৪৫ মিনিট)। অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে বড়ো দলে তা উপস্থাপন করতে বলুন (সময় ৪৫ মিনিট)। উপস্থাপনায় সহায়তা করুন। • সবশেষে পুরো অধিবেশন সংক্ষিপ্তাকারে বলুন।	৫ মিনিট

পাঠ সহায়ক ঝুঁকি শনাক্তকরণ এবং ঝুঁকির মূল্যায়ন

ভূমিকা

সকল ব্যবসায় / জীবিকায়ন এর ক্ষেত্রেই ঝুঁকি পরিমাপ করতে হয়, কেননা এটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে কৌশলগত ব্যর্থতা, পরিচালনার ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক ব্যর্থতা, বিপণনে বিঘ্ন ঘটা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যা। যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠানকে সব ধরনের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করা অসম্ভব, সেজন্য এটি নিশ্চিত করতে হবে যে প্রতিষ্ঠান তার ঝুঁকির বিষয়গুলো যথাযথভাবে বোঝে এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কৌশলের আলোকে সেই ঝুঁকির সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকা।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এক বিষয় নয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো অনেকটা পূর্ব-নির্ধারিত থাকে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া: প্রতিটি উদ্যোগকেই প্রতিনিয়ত তাদের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো বিশ্লেষণ ও অবলোকন করতে হবে এবং তা মোকাবিলার জন্য যথাযথ কৌশল গ্রহণ করতে হবে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি সামাজিক দায়িত্ব। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ব্যবসার পরিবেশগত দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকার মাধ্যমে ভবিষ্যতের অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা অথবা সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

ঝুঁকি:

ঝুঁকি বলতে সাধারণত কোনো কিছুর অনিশ্চয়তাকে বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে বোঝানো হয়। কিন্তু ব্যবসায়ের ভাষায় যে কোনো ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনাকে বোঝায়। এককথায় বলতে গেলে আর্থিক মূল্য পরিমাপযোগ্য ক্ষতিই হচ্ছে ঝুঁকি। ব্যবসায় ও ঝুঁকি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই যেখানে ব্যবসায়/জীবিকায়ন সেখানেই ঝুঁকি ।

ঝুঁকি শনাক্তকরণ:

যে ব্যবসায় ও জীবিকায়নে মুনাফার বা লাভের সম্ভাবনা বেশি সেখানে ঝুঁকিও বেশি। সেজন্য একজন সচেতন ব্যক্তি/ বিনিয়োগকারী হিসেবে ঝুঁকি সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। ব্যবসায়/যে কোনো কাজে সফলতা পেতে হলে ব্যক্তি/ বিনিয়োগকারীকে বুঝে-শুনে ঝুঁকি বহন করতে হবে। সর্বোপরি সঠিকভাবে বিনিয়োগ ঝুঁকি পর্যালোচনা/বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হলে ব্যবসায়/ জীবিকায়নে সফলতা পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। সফলভাবে ঝুঁকি বিশ্লেষণের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠান কী ধরনের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা শনাক্ত করা। প্রথমত আমরা সেইসব ঝুঁকির উপর আলোকপাত করব যেগুলো ক্ষতিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ঝুঁকি প্রতিষ্ঠানের ভেতর বা বাইরে যে কোনো জায়গাতেই থাকতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় আমরা অভ্যন্তরীণ ঝুঁকির সঙ্গে বাইরের ঝুঁকির পার্থক্য নির্ণয় করব।

অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি: প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সঙ্গতি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সহজপ্রাপ্যতা এবং প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ অভ্যন্তরীণ ঝুঁকির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কেনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের অভাব অথবা হয়ত আপনার ম্যানেজার চাকরি ছেড়ে চলে গেছে, বা উপকরণ ও সরঞ্জামাদি কেনার জন্য যথেষ্ট অর্থের অভাব রয়েছে।

বাইরের ঝুঁকি: যে সকল ঝুঁকি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সেগুলোই বাইরের ঝুঁকি। অভ্যন্তরীণ ঝুঁকির তুলনায় এসব ঝুঁকির ভবিষ্যতবাণী করা এবং সামলানো অত্যন্ত কঠিন। যেমন: গ্রাহকদের পছন্দ বদলে যাওয়া; রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বেচাবিক্রি কমে যাওয়া অথবা কিছু পণ্যের (খাদ্যে কিছু কিছু রাসায়নিক ব্যবহার) উপর সরকার আইনি নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

ঝুঁকির শ্রেণিবিভাগ: সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দিক এবং নানাবিধ কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকির শ্রেণিবিভাগ করা হয়। ঝুঁকি অভ্যন্তরীণ হতে পারে, আবার বাইরেরও হতে পারে। নিচে ছকে দ্বিমুখী ঝুঁকি দেখানো হলো-

অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি:

- ব্যবসায় পরিচালনায় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা
- দক্ষতার সীমাবদ্ধতা
- দলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব
- কর্মী পরিচালনায় অদক্ষতা
- পুঁজির সংকট

বাইরের ঝুঁকি:

- রাজনৈতিক
- অর্থনৈতিক
- সামাজিক
- প্রযুক্তিগত
- আইনগত
- দুর্যোগ

ঝুঁকি নিরূপণ:

ব্যবসায় উদ্যোগ যেসব ঝুঁকির মুখোমুখি রয়েছে সেগুলো একসাথে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সুতরাং ঝুঁকি মোকাবিলার কৌশল গ্রহণে সেই ঝুঁকিগুলোতে প্রাধান্য দিতে হবে যেগুলোর সবচাইতে বেশি নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে এবং ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে ধাপ ১-এ যে ঝুঁকিগুলো শনাক্ত করা হয়েছে সেগুলো ধাপ ২-এ নিরূপণ করা হবে।

নিচে দেখানো এ ধরনের একটি ছক ব্যবহার করে পরবর্তী প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:

- সম্ভাব্য ঝুঁকির নেতিবাচক প্রভাব কত বড়ো হতে পারে?
- এই ঝুঁকি ঘটার সম্ভাবনা কতটুকু?

Image: https://cms-static.wehaacdn.com

ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা সঙ্কট মোকাবিলার মত নয়। প্রকৃতিতে এর ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো অনেকটা পূর্ব-নির্ধারিত থাকে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিটি উদ্যোগকেই তাদের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণ ও অবলোকন করতে হবে, তা মোকাবিলার জন্য যথাযথ কৌশল গ্রহণ করতে হবে। ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা একটি সামাজিক দায়িত্ব। রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং ব্যবসার পরিবেশগত দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকার মাধ্যমে ভবিষ্যতের অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা অথবা সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

তাই সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে এবং সেগুলোর তাৎপর্য বিবেচনা করে, কৌশল নির্ধারণ করতে হবে যেন ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য সঠিক উপায় প্রস্তুতি রাখা যায়। সুতরাং, এককথায় ঝুঁকি প্রশমন হলো এমন একটি কৌশলগত উপায়, যা উদ্যোগকে যথাসম্ভব ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে সহায়তা করে।

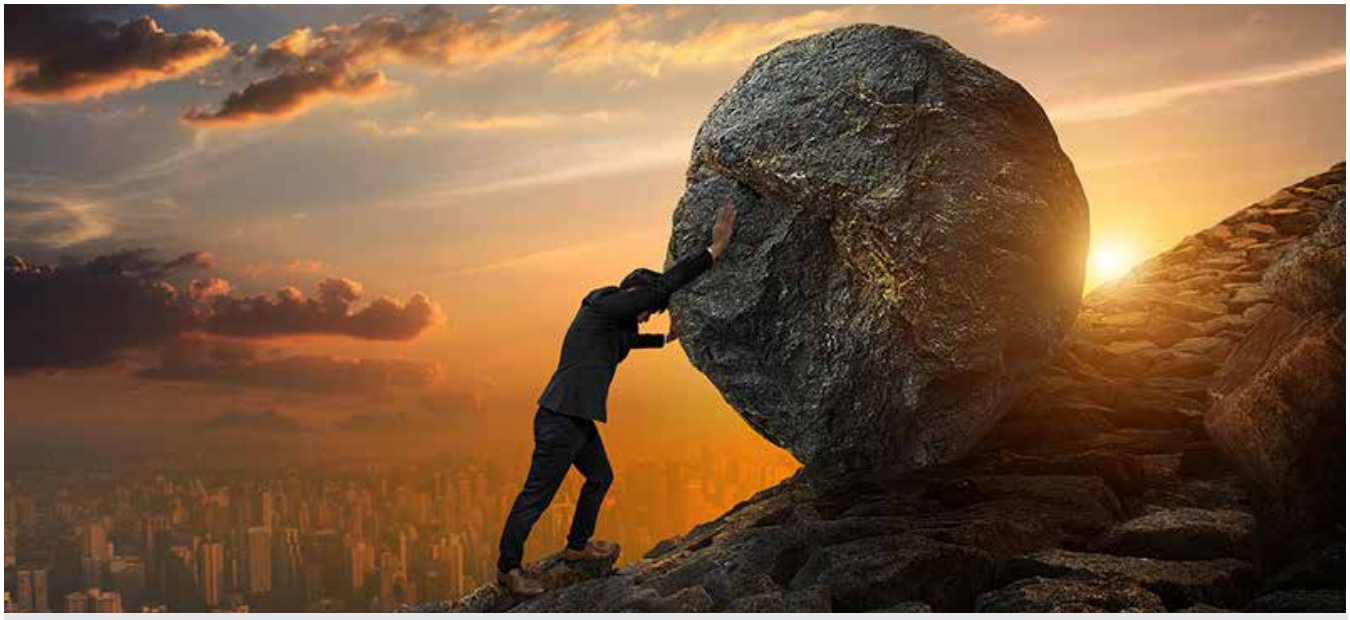

Image: https://tradestops.com/wp-content/uploads/2018/07/obstacles.jpg

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সর্বাধিক ব্যবহৃত তিনটি ধারণা:

- ঝুঁকি হ্রাসকরণ: ঝুঁকি হ্রাস করার অর্থ হলো, ঝুঁকি সংঘটিত হবার সম্ভাবনা কমিয়ে আনা। যদি তা রোধ করা সম্ভব না হয়, তবে তার ব্যাপকতার মাত্রা কমিয়ে আনা। সাধারণভাবে, প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সবচাইতে কার্যকর ধরন। উদাহরণস্বরূপ, কর্মক্ষেত্রে আগুন লাগার ঝুঁকি ধূমপান নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায় এবং অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে এর মাত্রা কমিয়ে আনা যায়।

- প্রস্তুতি: প্রস্তুতির অর্থ হলো, বিদ্যমান ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং তার জন্য একটি আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখা। আপদকালীন পরিকল্পনার মধ্যে প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড থাকতে হবে; যেমন, প্রয়োজনের সময় সম্পদ সহজলভ্য রাখা।

- প্রতিরোধ: প্রতিরোধ অর্থ ঝুঁকি সৃষ্টি করে এমন অবস্থার অপসারণ। উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন কর্মকাণ্ড পরিহার করে অথবা সেগুলোর সৃষ্টির ক্ষেত্রগুলোকে কমিয়ে আনার মাধ্যমে এটি করা যায়। বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বা সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডে অধিক সময় ও সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমেও এটি অর্জন করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো উদ্যোগ তার কাঁচামাল বা উৎপাদনের জন্য কেবল একটি উৎসের কাছে নির্ভরশীল থাকে, তাহলে অন্য উৎস যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। যদি উৎপাদন একটি ক্ষুদ্র প্রশিক্ষিত কর্মীদলের উপর নির্ভরশীল থাকে, তাহলে আরও কর্মীদের প্রশিক্ষিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। যদি দিনের নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়, তাহলে সেই অনুসারে কর্ম-পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ঝুঁকি নির্মূল করা না গেলেও, অনেক সময় তা অন্য ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা যায়।

ঝুঁকি মোকাবিলার পরিকল্পনা

পরিকল্পনা হলো এমন একটি ধাপ যা ভবিষ্যতের কর্মসূচি প্রণয়ন করে। কাজটি কখন হবে, কে করবেন, কোথায় করা হবে এই বিষয়গুলো কাজ করার পূর্বে ঠিক/চিন্তা/স্থির করার নামই হলো পরিকল্পনা। যে কোনো কাজের সাফল্য অনেকাংশেই পরিকল্পনার সফলতার উপর নির্ভরশীল। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজের সফলতা আসে না। কি ব্যক্তি জীবনে, কি সমাজ জীবনে, কি ব্যবসায় ও কি রাষ্ট্রীয় কাজে সবক্ষেত্রেই পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই যে কোনো ব্যবসায়/ জীবিকায়নের সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলা করা সম্ভব।

ঝুঁকি মোকাবিলার পরিকল্পনা

নিম্নের ছক অনুযায়ী ঝুঁকি মোকাবিলার পরিকল্পনা করা যেতে পারে:

ঝুঁকি	ঝুঁকির ধরন	মোকাবিলার ধরন	কিভাবে	কে এবং কখন
কর্মক্ষেত্রে আগুন লাগার ঝুঁকি	পরিচালনা সংক্রান্ত	হ্রাসকরণ	• ধূমপান নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে প্রতিরোধ • অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন	ম্যানেজার, আগামী সপ্তাহের মধ্যে
উৎপাদন একটি ক্ষুদ্র প্রশিক্ষিত কর্মীদলের উপর নির্ভরশীল	জ্ঞান	প্রতিরোধ	• আরও কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা	মালিক আগামী মাসের মধ্যে

অধিবেশন

০৫ সহনশীল জীবিকায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ব্যবসায় নির্বাচন

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে জানবেন ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

৪.১ ক্ষুদ্র ব্যবসায়/উদ্যোগ
৪.২ সম্ভাব্যতা যাচাই ও ব্যবসায় নির্বাচন
৪.৩ ব্যবসায় নির্বাচন পদ্ধতি ও চেকলিস্ট

পদ্ধতি

বক্তৃতা, উন্মুক্ত চিন্তা, আলোচনা।

উপকরণ

মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, মাস্কিং টেপ/ডক ক্লিপ।

সময় : ২ ঘণ্টা।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া :

আলোচ্য বিষয়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৪.১	• অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে 'ক্ষুদ্র ব্যবসায়/উদ্যোগ'– এ-বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনার আহ্বান জানান। • পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে (সহায়ক তথ্য ৪.১ অনুযায়ী) 'ক্ষুদ্র ব্যবসায়/উদ্যোগ' বিষয়ে আলোচনা করুন। • আবারও অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন, কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর বুঝিয়ে বলুন।	২০ মিনিট
৪.২	• অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে বস্তিকেন্দ্রিক জীবিকায়নের লক্ষ্যে 'সম্ভাব্যতা যাচাই ও ব্যবসায় নির্বাচন' সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। তাদের আলোচনার প্রধান পয়েন্টসমূহ বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। • পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে (সহায়ক তথ্য ৪.২ অনুযায়ী) বস্তিকেন্দ্রিক জীবিকায়নের লক্ষ্যে 'সম্ভাব্যতা যাচাই ও ব্যবসায় নির্বাচন' আলোচনা করুন। • অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন আছে কিনা জানতে চান। থাকলে তার উত্তর বুঝিয়ে বলুন।	৫০ মিনিট
৪.৩	• এই অধিবেশনের শেষ পর্ব: 'ব্যবসায় নির্বাচন পদ্ধতি ও চেকলিস্ট' নিয়ে আলোচনার অবতারণা করুন। সহায়ক তথ্য ৪.২ অনুযায়ী আলোচনা করুন। • অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন আছে কিনা জানতে চান। থাকলে তার উত্তর বুঝিয়ে বলুন।	৫০ মিনিট

৪.১ ক্ষুদ্র ব্যবসায়/ উদ্যোগ

ক্ষুদ্র উদ্যোগ বা ব্যবসায় বলতে সীমিত পুঁজি নিয়ে ছোটো আকারে পরিচালিত ব্যবসায় বোঝায়। উদাহরণ: মুদি দোকান, মোবাইল ফোন মেরামতের দোকান, সেলুন, খাবারের দোকান, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (পাঁপড় ভাজা, ফুচকা, চটপটি তৈরি, মোমবাতি তৈরি, নাশতাজাতীয় খাবার-দাবার তৈরি, হস্তশিল্প ইত্যাদি যেগুলো ছোটো পরিসরে এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি।

ক্ষুদ্র উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য

- বিনিয়োগের পরিমাণ: ৫০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা।
- কর্মচারীর সংখ্যা: ২ থেকে ৫ জন।
- উৎপাদন পদ্ধতি: মূলত স্থানীয় প্রযুক্তি এবং স্থানীয় সম্পদের উপর নির্ভরশীল।
- বিপণন: প্রধান লক্ষ্য স্থানীয় ও আঞ্চলিক বাজার।
- হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি: সাধারণ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, যা মূলত নোট খাতায় সংরক্ষণ করা হয়।

উদ্যোক্তা

উদ্যোক্তা একজন ব্যক্তি যিনি, একটি ব্যবসায় অথবা ব্যবসায়িক ঝুঁকির দায়দায়িত্ব নেন এবং যিনি এই উদ্যোগ গ্রহণের তাৎপর্য, দায়দায়িত্ব, সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি এবং ফলাফল সম্পর্কে সচেতন। উদ্যোক্তা একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা যিনি ভূ-সম্পদ, শ্রম এবং মূলধনের সমন্বয়ে নিয়মিত পণ্য উৎপাদন অথবা সেবা প্রদান এবং তার বাজার তৈরি করেন।

৪.২ সম্ভাব্যতা যাচাই ও ব্যবসায় নির্বাচন

যে কোনো ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে এর সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। লাভজনক ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ব্যবসায় শুরু করার পূর্বেই সম্ভাব্যতা যাচাই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, যে ব্যবসায়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা সফলতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে কিনা। আরো জানা সম্ভব, লাভক্ষতির সম্ভাবনা কতটুকু, পণ্য বাজারজাতকরণ পদ্ধতি, পণ্যের চাহিদা কতটুকু, ব্যবসায়টি দুর্যোগের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু ইত্যাদি। ব্যবসায়ের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য কিছু বিষয় অনুসরণ করা উচিত।

ক. বাজার বিশ্লেষণ
খ. প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ
গ. আর্থিক বিশ্লেষণ
ঘ. চাহিদা নিরূপণ
ঙ. দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ।

ক. বাজার বিশ্লেষণ: বাজার বিশ্লেষণ বিষয়টি নিয়ে ভাবার সময় প্রথমেই বিবেচনায় আসে দুটি প্রশ্ন। ভবিষ্যতে এই সেবার চাহিদা কেমন হবে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন:

নির্দেশক	হাঁ/ না
বাজারে সম্ভাব্য পণ্য বা সেবা উৎপাদনের প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিক সহজলভ্য কিনা	
পণ্য বা সেবা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা আছে কি?	
সরবরাহে ব্যবস্থা নিষ্কণ্টক কিনা?	
বাজারে সম্ভাব্য উৎপাদিত পণ্য বা সেবার চাহিদা কি স্থিতিস্থাপক?	
ভোক্তার পণ্য বা সেবার প্রতি ঝোঁক বা প্রবণতা কেমন?	
মার্কেটিং নীতিসমূহ প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত ও আইনগত সীমাবদ্ধতাসমূহ	

খ. প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ: ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ করা খুবই প্রয়োজন। এসময় যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে তা হচ্ছে:

নির্দেশক	হাঁ/ না
উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রাথমিক প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিনা?	
কাঁচামালের পর্যাপ্ততা, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সরবরাহ সহজলভ্য কিনা?	
সর্বোচ্চ উৎপাদনক্ষমতা নির্ণয় করা হয়েছে কিনা?	
উৎপাদন প্রক্রিয়া সঠিক ও যথোপযুক্ত কিনা?	
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সঠিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে কিনা?	
প্রস্তাবিত স্থান (সাইট) ও যন্ত্রপাতি যথোপযুক্ত হয়েছে কিনা?	

গ. আর্থিক বিশ্লেষণ: ব্যবসায়টি লাভজনক হবে কিনা তা আর্থিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই করতে হবে। আর্থিক বিশ্লেষণের পর্যায়ে যে সকল বিষয়াদি বিবেচনা করতে হবে তা হচ্ছে:

নির্দেশক	হাঁ/ না
ব্যবসায়ে কত টাকা বিনিয়োগ করা প্রয়োজন?	
অর্থের সম্ভাব্য উৎস কি? (ব্যক্তিগত তহবিল/ ঋণ গ্রহণ/ দুটোই)	
আয় ও ব্যয় বাদে মাসে/সপ্তাহে কত টাকা লাভ থাকবে?	
ঋণ গ্রহণ করতে হবে কি?	
ঋণ গ্রহণ করতে হলে মাসিক/সাপ্তাহিক ঋণ পরিশোধের কিস্তি কত টাকা হবে?	
লাভের টাকায় কিস্তি পরিশোধ করেও পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য টাকা থাকবে কি?	

ঘ. চাহিদা নিরূপণ: যে কোনো ব্যবসায়ের সম্ভাব্যতা নিরূপণের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক চাহিদা যাচাই। উদ্যোক্তা কোন ব্যবসায়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কিংবা কোন ব্যবসায়ে তার দক্ষতা আছে তা ব্যবসায় নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক, তবে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বিশ্লেষণও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, যিনি উদ্যোক্তা তাঁকে বেবচরায় রাখতে হবে যে, বাজারে যদি উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা পর্যাপ্ত না হলে ব্যবসায়ে সফলতা আসার সম্ভাবনা নাই। সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রমে উৎপাদিত পণ্য/সেবার চাহিদা নিরূপণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করতে হবে:

নির্দেশক	হাঁ/ না
পণ্যের চাহিদা কি বছরের সবসময় সমান থাকে?	
• পণ্যের ভোক্তা কারা? • আর্থিক অবস্থা বিবেচনায়: মধ্যবিত্ত/নিম্ন-মধ্যবিত্ত/ নিম্নবিত্ত • জেন্ডার বিবেচনায়: নারী/পুরুষ • বয়স বিবেচনায়: সকল বয়সের/ যুবকদের/শিশুদের	
পণ্যটি কোন এলাকায় বিক্রি হবার সম্ভাবনা বেশি: দোকানে/ফুটপাতে	
পণ্যটি কি কোনো নির্দিষ্ট মৌসুমে বিক্রি হয়? শীতকালে/ সবসময়	

কোনো নির্দিষ্ট মৌসুমে পণ্যটির বিক্রি বেড়ে যায়?	
দিনের নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যটি বেশি বিক্রি হয় কিনা?	
পণ্যের চাহিদা বাড়ানোর জন্য কি কি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে?	

ঙ. দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ: বিভিন্ন আপদের কারণে মানুষের জীবন-জীবিকা তথা আয়-রোজগার বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন পেশাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপদের সমন্বিত ও বিভিন্ন স্তরসমূহকে চিহ্নিতকরণ; বিপদাপন্নতা ও ঋতুবৈচিত্র্যকে একসাথে বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান চর্চাসমূহ এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যত দুর্যোগসহিষ্ণু বিষয়সমূহকে তুলে আনা জরুরি। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা নিম্নরূপ:

নির্দেশক	হাঁ/ না
কোন দুর্যোগের কারণে জীবিকায়ন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়?	
আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে জীবিকায়ন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?	
দুর্যোগের দরুন কোন পেশায় কেমন ক্ষতি? (বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য নিচের ছকটি ব্যবহার করুন)	
দুর্যোগকালেও কোন পেশা কম ঝুঁকিপূর্ণ?	
দুর্যোগ ও আবহাওয়া/জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমিয়ে স্থায়িত্বশীল জীবিকায়ন কীভাবে হতে পারে?	

দুর্যোগের দরুন কোন পেশায় কেমন ক্ষতি	পেশা	স্বাভাবিক সময়ে মাসিক আয়	দুর্যোগের সময় মাসিক আয়
		১. <২০০০ টাকা,	
		২. ২০০০-৪০০০ টাকা	
		৩. ৪০০০-৬০০০ টাকা	
		৪. ৬০০০-৮০০০ টাকা	
		৫. ৮০০০+	

৪.৩ ব্যবসায় নির্বাচন প্রস্তুতি

আপনি প্রকৃতই ব্যবসায় করতে চান কি না সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিন: আপনি আপনার সম্পত্তির একটি অংশ (আশা করি পুরোটা নয়) নিয়ে ঝুঁকি নিচ্ছেন। এর ফলে আপনি অস্বাভাবিক কোনো পরিণতি বরণ করতে পারেন। এর অর্থ এমন একটি জীবন যা আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেখানে দীর্ঘ কর্মঘণ্টা আপনার পারিবারিক জীবন বা আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ডগুলো দূরে সরিয়ে দেবে। যেখানে বাড়তি চাপ সহ্য করার এমন সব অভিজ্ঞতা হবে, যেগুলো কর্মচারী হিসেবে আপনি আগে কখনও অনুভব করেননি।

কোন ব্যবসায় এবং কোথায়, তা সিদ্ধান্ত নিন: যখন আপনি এই আত্মবিশ্বাস অর্জন করবেন যে, সফল উদ্যোক্তা হবার মত বৈশিষ্ট্য আপনার আছে এবং আপনি প্রকৃতই ব্যবসায় করতে চান, তখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনার জন্য কোন ব্যবসায় যথোপযুক্ত হবে এবং কোন এলাকায় এই ব্যবসায় করা সবচাইতে ভালো হবে। এই অধিবেশনের পরবর্তী ধাপে নির্ধারণ কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সার্বক্ষণিক না খণ্ডকালীন ব্যবসায়, তা সিদ্ধান্ত নিন: খণ্ডকালীন ব্যবসায় পরিচালনার সুবিধা এবং অসুবিধা দুইই রয়েছে (এ-ধরনের ব্যবসায় অবসর বা খণ্ডকালীন সময়ে শুরু করা যায়)।

ব্যবসায় নির্বাচন কৌশল চেকলিস্ট

- তাড়াহুড়া না করে আপনার জন্য সঠিক ব্যবসায়টি নির্বাচনের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। সুযোগ হাতছাড়া করার জন্য আপনাকে কোনো জরিমানা গুনতে হবে না। নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য বিস্তর পরিকল্পনার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা এবং সার্বিক জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ।

- অতিমাত্রায় চ্যালেঞ্জিং এমন কোনো ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হবেন না। বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে যুক্ত হবার বদলে আপনার জন্য উপযুক্ত এমন কিছু নির্বাচন করুন।

- দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক সম্ভাবনা রয়েছে এমন ব্যবসায় চিহ্নিত করুন।

- যে সময়ে যা করা প্রয়োজন, তা সম্পন্ন না করা একটি ভুল। এর অর্থ, এ মুহূর্তে হয়ত আপনার সামনে একটি বড় সম্ভাবনা রয়েছে, যেটি আপনি হয়ত দেখলেনই না।

- এমন ব্যবসায় খুঁজুন যার বর্তমান এবং ভবিষ্যত বাজার রয়েছে।

- টিকে থাকতে হলে আপনার পণ্যের দাম বাজারে সর্বনিম্ন হতে হবে।

- যে ব্যবসায় আপনি জানেন না তার জন্য বাজি ধরবেন, নাকি যেটি আপনি জানেন তার জন্য বাজি ধরবেন?

- আপনি যদি কোনো পণ্য উৎপাদন করতে চান এবং উপকরণাদি অন্যের কাছ থেকে কিনতে হয়, তাহলে সর্বনিম্ন দরদাতা/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ভালো-মন্দ সবগুলো দিক বিবেচনা করে দেখুন। অন্য কথায়, সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

ব্যবসায় নির্বাচনের জন্য স্কোর কার্ড পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে, প্রথমে একজন উদ্যোক্তা কিছু সম্ভাবনাময় ব্যবসায় নির্বাচন করবেন। এরপর নিচের চেকলিস্ট-এর মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত ব্যবসায়গুলোর তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে পারবেন ১-১০ এর মধ্যে নম্বর প্রদান করে। এ ধরনের বিশ্লেষণ তাকে একটি ব্যবসায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

উদাহরণস্বরূপ, ধরি মি. রহমান তিনটি ব্যবসায়ের ধারণা দিলেন। এগুলো হলো, ফার্স্ট ফুডের দোকান, অলঙ্কার এবং ছোট গার্মেন্টস। কিন্তু তিনি মনস্থির করতে পারছেন না, কোনটি তিনি শুরু করবেন। তার এই দোদুল্যমানতা দূর করে সুনির্দিষ্ট একটি ব্যবসায় নির্বাচন করতে তিনি স্কোর কার্ড পদ্ধতি ব্যবহার করেন। ব্যবহৃত পদ্ধতিটি নিম্নরূপ:

ব্যবসায় নির্বাচনের স্কোর কার্ড

লক্ষ্য	গৃহভিত্তিক খাবার প্রস্তুত	মোবাইল ফোন মেরামতের দোকান	ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়
১. আমি কি কাজটি জানি?	০৮	০৫	০৭
২. এর কি বাজার রয়েছে?	১০	০৭	০৯
৩. বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট টাকা আছে?	০৮	০৭	০৫
৪. এটি কি লাভজনক?	০৮	০৮	১০
৫. আমার কি যথেষ্ট সময় রয়েছে?	১০	১০	১০
সর্বমোট	৪৪	৩৭	৪১

উপরের ছক থেকে আমরা দেখি যে, লক্ষ্যগুলোর বিপরীতে 'গৃহভিত্তিক খাবার প্রস্তুত' সর্বোচ নম্বর পেয়েছে। এ ধরনের বিশ্লেষণ আমাদেরকে নিরপেক্ষভাবে/নৈর্ব্যক্তিকভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়টি নির্বাচনে সাহায্য করবে।

অধিবেশন

০৬ সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে জানবেন ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

- সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনা কী ও কীভাবে তা প্রস্তুত করতে হয় তা জানবেন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে জানবেন ও অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সহনশীল ব্যবসায় কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন ও অন্যকে তৈরিতে সহায়তা করতে পারবেন।

পদ্ধতি

বক্তৃতা, উন্মুক্ত চিন্তা, আলোচনা।

উপকরণ

মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, মাস্কিং টেপ/ডক ক্লিপ।

সময় : ৩ ঘণ্টা।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া :

আলোচ্য বিষয়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৫.১	• অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন। • সহায়ক সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনার উপর আলোচনার সূত্রপাত করবেন। সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনার কী এবং কীভাবে তা প্রস্তুত করতে হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করবেন। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন আছে কিনা জানতে চান। থাকলে তার উত্তর বুঝিয়ে বলুন।	৩০ মিনিট
৫.২	• সহায়ক প্রকারভেদ সম্পর্কে সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করুন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন ও বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। এবারে পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে পূর্বে প্রস্তুতকৃত 'ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব' (সহায়ক তথ্য ৫.২ অনুযায়ী) ব্যাখ্যা করুন।	৩০ মিনিট
৫.৩	নিচের ছকটি ব্যবহার করে ' সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রস্তুত' করার প্রক্রিয়া শুরু করুন। এই পর্বে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ জরুরি। আলোচনার মাধ্যমে (পাঠ সহায়ক ৫.৩) ব্যবসায়িক কর্ম-পরিকল্পনার সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদেরকে পরিচিত করে তুলুন এবং ব্যবসায় পরিকল্পনার এসব কলাকৌশলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন যে, এসব ফরম তাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত ধারণার উন্নয়নে, অথবা বর্তমান ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদেরকে ৩টি দলে বিভক্ত করে সহায়ক পাঠ ৫.৩-এ প্রদত্ত ফরম পূরণ করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ আলোচনাক্রমে ফরমগুলো পূরণের মাধ্যমে 'ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রস্তুত' করুন। প্রতিটি দল স্বতন্ত্রভাবে পূরণকৃত ফর্ম বা 'ব্যবসায়/ পরিকল্পনা' বড়ো দলে উপস্থাপন করবেন। সহায়ক এ পর্বে সকলের অংশগ্রহণমূলক আলোচনার পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখুন। তিনি দলসমূহের কাজের মেরিট ও ডিমেরিট উল্লেখ করুন। সবশেষে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।	২ ঘন্টা

পাঠ সহায়ক

৫.১ সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনা কী

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবমুক্ত লাভজনক ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনার পূর্ণাঙ্গ চিত্রই সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনা। এটি ব্যবসায়ীর জন্য একটি দিক-নির্দেশক যা তাকে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে সাহায্য করে। একজন উদ্যোক্তা ব্যবসায় পরিকল্পনাকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে থাকলে তার পথ হারানোর সম্ভাবনা কম। নিশ্চিন্তে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হতে পারে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য এটি উদ্যোক্তার কাছে পথ চলার মানচিত্র। ব্যবসায় পরিকল্পনায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যত সম্ভাবনার রূপরেখা অর্থাৎ ব্যবসায়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়। এছাড়া উৎপাদন পরিকল্পনা, আইনি অনুমোদন, মূলধন সংগ্রহ, বিপণন, ব্যবসায়ের স্থান নির্ধারণ, কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিকল্পনা একটি উত্তম তথ্যসূত্র ও দলিল হিসেবে কাজ করে।

সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনা হচ্ছে: দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবমুক্ত জীবিকায়নের পথ মানচিত্র তৈরি করা, একটি লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কাজ করা এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ অনুসরণ করা। একটি ছোট আকারের ব্যবসায় বা একটি আয়মূলক প্রকল্প শুরু করার আগে সে বিষয়ে পরিকল্পনা ও গবেষণা করা। ব্যবসায় পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা প্রয়োজন:

ক. জানুন-বুঝুন ও ব্যবসায় পরিকল্পনা করুন: ব্যবসায়ের আইডিয়া বা ধারণাকে বাস্তব ব্যবসায়ে রূপ দেয়ার আগে বুদ্ধিমানের কাজ হলো একটু খোঁজ-খবর, গবেষণা করে নেয়া। যে পণ্য বা সেবা বিক্রি করার কথা ভাবছেন আসলেই তার বাজার আছে কিনা যাচাই করে নিন। তারপর যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা তৈরি করুন।

খ. সহায়তা নিন: ব্যবসায়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে একজন ঐ ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা আছে এমন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত কারোর পরামর্শ নেয়া উচিত। আপনার প্রতিযোগী নয় এমন একজন সফল ব্যবসায়ী কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসায় সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরামর্শ নিন। সফলতার পথ জেনে নিন।

গ. উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করুন: কোন জায়গায় দোকান করবেন? ফুটপাতে হকার হিসেবে ব্যবসায় করুন আর উৎপাদনমুখী ব্যবসায় করুন না কেন, উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিশ্চিত হয়ে নিন কোথায় আপনার ক্রেতা সমাগম বেশি হবে। মনে রাখতে হবে, ফুটপাতভিত্তিক ব্যবসায় যে কোনো সময় উচ্ছেদ করা হতে পারে। আবার বস্তির অভ্যন্তরে এমন কোনো ব্যবসায় যেমন, কাঠের আসবাব তৈরি, মোবাইল মেরামতের দোকান- এসব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। বস্তির অভ্যন্তরে তা অবৈধ হতে পারে।

ঘ. মূলধন সংগ্রহ করুন: ব্যবসায় শুরু করার জন্য 'প্রয়োজনীয়' পরিমাণ মূলধন আবশ্যক। পরিকল্পনা অনুযায়ী মূলধন নিজে যোগান দিতে না পারলে আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করা যেতে পারে। ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়ক ঋণ নেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সমিতি বা এনজিওর সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনাও যাচাই করুন।

ঙ. আইনি কাঠামো ঠিক করুন: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নানা রকম আইনি কাঠামো হতে পারে। প্রতিটি কাঠামোর নিজস্ব সুবিধা-অসুবিধা, জটিলতা ইত্যাদি রয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে নিয়ে ব্যবসায়ের আইনি কাঠামো নির্ধারণ করুন। ব্যবসায়ের আইনি কাঠামো হতে পারে একমালিকানা, অংশীদারি, অলাভজনক, বা সমিতি। প্রয়োজনে ব্যবসায়ের অনুমতিপত্র, লাইসেন্স সংগ্রহ করুন। ব্যবসায় শুরুর আগেই এসব সংগ্রহ করুন যাতে ব্যবসায়ের প্রথম দিন থেকেই আপনার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের আইনগত বৈধতা নিশ্চিত থাকে। দোকানের জন্য ট্রেড লাইসেন্স জরুরি।

চ. কর্মী নিয়োগ করুন: আপনার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য কর্মী প্রয়োজন হলে সে সংক্রান্ত আইনগুলো বিবেচনায় রাখুন। কোনো কোনো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কর্মীদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা রাখা বাধ্যতামূলক হতে পারে। যেমন: নিম্নতম মজুরি/বেতন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ছ. দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবমুক্ত লাভজনক ব্যবসায় নির্বাচন: ব্যবসায় পরিকল্পনা করার সময়ে বিবেচনা করতে হবে ব্যবসায়টি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবমুক্ত কিনা। এর বিভিন্ন প্রেক্ষিত রয়েছে। স্থানিক দুর্যোগে ব্যবসায়ের কাঁচামাল/উপকরণ সংগ্রহ কষ্টকর/অসম্ভব হয়ে পড়ে কিনা? ব্যবসায়ের কাঁচামাল/উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে কিনা? উৎপাদিত পণ্য পরিবহন কষ্টকর/অসম্ভব হয়ে পড়ে কিনা? উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হ্রাস পায় কিনা? এসব বিষয় বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ব্যবসায়টি সহনশীল কিনা?

৫.২ সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব

সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনা হলো দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবমুক্ত লাভজনক ব্যবসায়ের ভবিষ্যত রূপরেখা, যার সাহায্যে উদ্যোক্তা তার সকল কার্যক্রম ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের দিকে ধাবিত করে। তাই পরিকল্পনা যত বাস্তবমুখী হয় প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন ততই সহজ হয়। এককথায় বলা যায়, ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবসায়ের সফলতা অর্জনের পথ-প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। নিম্নে ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

ক. ব্যবসায়িক রূপরেখা: সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনা হলো ব্যবসায়ের সামগ্রিক রূপরেখা। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, কার্যপরিধি, প্রতিযোগী ইত্যাদি বিষয়গুলোকে ব্যাপকভাবে গুরুত্ব প্রদান করে, ফলে সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনার মধ্যে ব্যবসায়ের যাবতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে রূপরেখা প্রদান করে। তাই ব্যবসায় পরিকল্পনাকে সহনশীল ব্যবসায়িক রূপরেখা হিসেবে গণ্য করা হয়।

খ. নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার: সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনাকে ব্যবসায়ের যাবতীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়। নিয়ন্ত্রণ হলো পূর্ব নির্ধারিত মান অনুযায়ী কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং বিচ্যুতি নির্ধারণপূর্বক তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ব্যবসায় পরিকল্পনায় যেহেতু যাবতীয় কার্যাবলীর মান অন্তর্ভুক্ত থাকে সেহেতু এরূপ মানের সাথে বর্তমান কার্যাবলীকে তুলনা করে ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাই আধুনিক বিশ্বে ব্যবসায় পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ. নির্দেশনায় সহায়তাদান: সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনা নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে থাকে। সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনার মধ্যে কোন্ কাজ, কখন সম্পাদন করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, কাদের সাহায্যে করতে হবে, কত সময়ের মধ্যে করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়। এরূপ পরিকল্পনায় ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর সাফল্য দৃষ্টিগত হলে উদ্যোক্তার আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যতে ব্যবসায় সম্প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করে।

ঘ. মূলধন সংগ্রহ: মূলধন ব্যবসায়ের প্রাণস্বরূপ। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের প্রাথমিক মূলধন সাধারণত উদ্যোক্তা নিজেই সরবরাহ করে থাকে। তবে অনেক সময় অধিক মূলধনের প্রয়োজন দেখা দিলে তা উদ্যোক্তার একার পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে কোনো ব্যাংক বা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এরূপ অবস্থায় ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ঋণ মঞ্জুরের আগে ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনার দিকগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকে। সে ক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিকল্পনা ঋণদাতার নিকট তথ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

ঙ. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার মূলত সঠিক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। ব্যবসায়িক পরিকল্পনার মাধ্যমে কোন সম্পদ কখন, কিভাবে ও কতটুকু ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়, ফলে সম্পদের অপচয় হ্রাস পায় এবং কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

চ. সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা: সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনো সিদ্ধান্ত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ব্যবসায় পরিকল্পনায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যের বা লক্ষ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে। ফলে ব্যবসায় পরিকল্পনার মাধ্যমে তা অর্জনের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত তথ্যেরও প্রয়োজন যা ব্যবসায় পরিকল্পনা হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ছ. সুষ্ঠু সমন্বয়: ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়। এরূপ সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবসায় পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ব্যবসায় পরিকল্পনার মধ্যে কোন্ কাজ কখন, কিভাবে ও কে সম্পাদন করবে ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া থাকে ফলে পরবর্তীতে সুষ্ঠু সমন্বয় সহজ হয়।

জ. ব্যয় ও অপচয় হ্রাস: প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যয় ও অপচয় হ্রাস করা। সুনির্দিষ্ট ও পূর্ব- পরিকল্পনা মোতাবেক সম্পদ ও সময়ের ব্যবহার এরূপ ব্যয় অপচয় হ্রাস করে। ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবসায়ে নিয়োজিত সকল প্রকার সম্পদের উপর্যুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা প্রদান করে। ফলে প্রতিষ্ঠানে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যয় হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে অপচয় হ্রাস পায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, সহনশীল ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবসায়ের পথ-প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

৫.৩ ব্যবসায় কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত

ব্যবসায়িক কর্ম-পরিকল্পনা

নাম:	তারিখ:
ভূমিকা	
আমার প্রস্তাবিত ব্যবসায় হলো: --- --- ---	
ব্যবসায় এলাকা:	
যে দক্ষতাগুলো আমার আছে: ● ●	যে দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করতে হবে: ● ●
আমার যে সম্পত্তি আছে: ● ●	যে সম্পদ আমার দরকার: ● ●

বিপণন	
আমি যাদের কাছে এটি বিক্রি করব: ● ● ●	আমি যেভাবে আমার পণ্য/সেবার প্রসার ঘটাব: ● ● ●

প্রতিযোগী

কে	কোথায়	কেন

ব্যবসায় পরিচালনা	
এক বছরের জন্য উৎপাদন পরিকল্পনা (শিডিউল এবং পরিমাণ) • ১ সপ্তাহ • ১ মাস • ১ বছর	এক বছরে সর্বমোট যে পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে (সেবা: সেবা প্রদান ঘণ্টা/দিন) তা হলো (সতর্কতা: মৌসুমগত উত্থান-পতনগুলোকে বিবেচনায় রাখুন) --- ---
যেসব মানুষ কাজ করবে (কে, কতজন): --- --- --- --- --- ---	

ব্যবসায় ব্যয়	
ব্যবসায় শুরুর ব্যয়: ● ● মোট	ব্যবসায় পরিচালনার ব্যয় (এক বছরের জন্য): ● ● মোট

বিক্রির আয়		
পণ্য/সেবার মূল্য: ----------		হিসাবকৃত বিক্রয়
	দিন প্রতি	
	সপ্তাহ প্রতি	
	মাস প্রতি	
	বছর প্রতি	

ব্যবসায়ের সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ	
সুযোগসমূহ: ● ● ●	চ্যালেঞ্জসমূহ: ● ● ●

ছবি: ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

অধিবেশন

০৭ সহনশীল ব্যবসায় পরিচালনায় হিসাবরক্ষণ

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে জানবেন ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

- হিসাব কী? হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
- হিসাব লেখার কলাকৌশল
  - জমাখরচ বই সংরক্ষণ
  - রশিদ বই সংরক্ষণ
  - বাকি খাতা সংরক্ষণ
  - আয়ের বিবরণী প্রস্তুত

পদ্ধতি

বক্তৃতা, উন্মুক্ত চিন্তা, আলোচনা।

উপকরণ

মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, মাস্কিং টেপ/ডক ক্লিপ।

সময় : ৯০ মিনিট।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া :

আলোচ্য বিষয়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৬.১	• অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন। • এই অধিবেশনে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সাথে ব্যবসায়ের যাবতীয় হিসাবরক্ষণ ও তার গুরুত্ব আলোচনা করবে। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন 'হিসাবরক্ষণ' বলতে কী বোঝেন। তাদের মতামতগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনবোধে প্রশ্ন করে আপনার প্রত্যাশা বের করে আনুন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন এবার আমরা হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করব। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে আমরা এক এক করে তা বলবো। তাদের মতামতগুলো শুনুন ও বোর্ডে/পোস্টার পেপারে লিখুন। প্রয়োজনবোধে প্রশ্ন করে গভীরে গিয়ে আলোচনা আরো আনন্দদায়ক করে তুলুন। এবার তাদের মতামতগুলো এবং আপনার ধারণা সমন্বয় করে হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত ধারণাটি মাল্টিমিডিয়া/ফ্লিপ চার্ট পেপারে লিখে আলোচনা করুন।	৩০ মিনিট
৬.২	• অংশগ্রহণকারীদের একটি সাধারণ হিসেবের খাতা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করুন তারাও কি তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এই রকম খাতা ব্যবহার করে কিনা। হয়তো কেউ কেউ 'হ্যাঁ' আবার কেউ কেউ 'না' বলতে পারে। এবার আপনি যারা 'হ্যাঁ' বলেছে তারা কিভাবে খাতায় হিসেব রাখে তা জানতে চান। আর যারা 'না' বলেছে তাহলে তারা কিভাবে হিসাব রাখে তাও জানতে চান। এবার যে কোনো একটি ব্যবসায়ের সম্পদের তালিকা যা একটি লেজারে সুন্দরভাবে ছকবদ্ধ আছে তা দেখিয়ে আলোচনা করুন। সহায়ক এক্ষেত্রে সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো এক এক করে আলোচনা করবেন এবং তা বোর্ডে লিখে বুঝিয়ে বলবেন। যেমন- - জমাখরচ বই সংরক্ষণ - রশিদ বই সংরক্ষণ - বাকি খাতা সংরক্ষণ - আয়ের বিবরণী প্রস্তুত এছাড়াও সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের গৃহীত শিল্প উদ্যোগের উপর ভিত্তি করে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।	৬০ মিনিট

পাঠ সহায়ক হিসাবরক্ষণ

৬.১ হিসাবরক্ষণ কী?

যে কোনো ব্যবসায়িক কাজে কিছু না কিছু লেনদেন বা আদান-প্রদান হয়ে থাকে। আদান-প্রদান ছাড়া কোনো ব্যবসায়ই হতে পারে না। তবে এ সকল লেনদেন বা আদান-প্রদান আর্থিকভাবে পরিমাপযোগ্য। ব্যবসায়ের লেনদেনগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে তারিখ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে লিখে রাখাকেই বলে হিসাবরক্ষণ।

হিসাবের প্রয়োজনীয়তা:

হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যবসায়ের একটি মূল বিষয়। ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে সঠিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির উপর। ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে ব্যবসায়ের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সঠিক হিসাবরক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয় ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ। হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে নিম্নলিখিত আর্থিক বিষয়গুলো জানা যায়:

- ব্যবসায়ের অর্থ কোথা থেকে আসছে
- অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে এবং কীভাবে (খাতে) ব্যয় হচ্ছে
- ব্যবসায়ে কার কাছ থেকে কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে
- ব্যবসায়ে কে কি পরিমাণ অর্থ পাবে
- ব্যবসায়ে কি পরিমাণ লাভ বা ক্ষতি হয়েছে
- ব্যবসায়ে বর্তমান মূলধন কত এবং এ অর্থ কীভাবে, কোথায় আছে?

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো জানার ফলে একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসায়ের আর্থিক লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয়।

- সুশৃঙ্খল হিসাব নিম্নলিখিত বিষয়ে একজন উদ্যোক্তাকে সহায়তা করে।
- সংগ্রহকৃত অর্থ সম্পর্কিত তথ্য আপডেট করতে সাহায্য করে।
- প্রদানকৃত টাকার হিসাব পেতে সাহায্য করে।
- লাভ/ক্ষতি জানা যায়।
- কমপক্ষে পরবর্তী ছয় মাসের ক্যাশ ফ্লো জানা যায়।
- ব্যাংকের ব্যালেন্স জানা যায় যা হিসাব বই-এ প্রত্যেক মাসে পরীক্ষা করা যায়।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি জানা যায়।
- বিল তৈরি, রিসিপ্ট, ভাউচার সম্পূর্ণ বিবরণ দেয় এবং এগুলো প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে কাজ করে।

৬.২ ব্যবসায়ে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ: ব্যবসায়ে হিসাব রাখা খুবই জরুরি। ব্যবসায়ের শুরু থেকেই হিসাব রাখতে হবে।

দৈনিক জমা-খরচের হিসাব

ব্যবসায়ের টাকা আলাদা রাখা উচিত। সংসার বা নিজের খরচের টাকার সাথে ব্যবসায়ের টাকা ও হিসাব মেলানো ঠিক নয়। এজন্য দিনের হিসাব দিনেই রাখা উচিত। দিনের হিসাব দিনে রাখলে ভুলে যাওয়ার ভয় থাকবে না। ব্যবসায়ের টাকা অন্য কোনো খাতে ঢুকে যাবার ভয় থাকবে না। অন্য খাতে কোনোভাবে ঢুকে গেলেও খুঁজে বের করা যাবে। নিচের ছক অনুযায়ী আমরা হিসাব রাখতে পারি:

তারিখ: ১ জানুয়ারি ২০১৪	জের		১৫০.০০
	নগদ বিক্রয়		৫০০.০০
	বাকি বিক্রয় থেকে আসা		৪৫০.০০
	মোট		**১,১০০.০০**
	বাদ খরচ		
	কাঁচামাল ক্রয়	৫০০.০০	
	মজুরি প্রদান	১০০.০০	
	খুচরা খরচ	৫০.০০	
	মোট		**৬৫০.০০**
	জের		**৪৫০.০০**

কাঁচামালের হিসাব:
প্রতিটি কাঁচামালের হিসাব আলাদা আলাদা রাখতে হবে। এভাবে রাখলে পণ্য উৎপাদনের জন্য কী পরিমাণ কাঁচামাল খরচ হচ্ছে, তা বের করা যাবে। পণ্যের উৎপাদন খরচ বের করা যাবে। এতে ব্যবসায়ী তার পণ্যের বিক্রয়মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারবে।

কাঁচামাল ক্রয়ের হিসাব
কাঁচামালের নাম: ডাল

তারিখ	পরিমাণ	দর/মূল্য	মোট মূল্য	সর্বমোট

বিক্রয়ের হিসাব:
নগদ ও বাকি দুই ধরনের বিক্রয়ের হিসাব খাতায় লিখে রাখতে হবে। তাহলে সহজেই মোট বিক্রয়ের হিসাব পাওয়া যাবে।

তারিখ	পণ্যের নাম	পরিমাণ	দর	মোট মূল্য	সর্বমোট

বাকি বিক্রয়ের হিসাবঃ

বাকিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে ক্রেতার নামে বা প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব রাখতে হবে। দিনের হিসাব দিনেই রাখতে হবে।

বাকি বিক্রয়					আদায়		
তারিখ	পণ্যের নাম	পরিমাণ	মোট মূল	সর্বমোট টাকা	তারিখ	টাকা	সর্বমোট টাকা

খুচরা খরচের হিসাবঃ

দৈনিক খুচরা খরচের হিসাব খাত অনুযায়ী রাখতে হবে। পরে এই হিসাব দেখা যাবে। কোনো খরচ বেশি হচ্ছে মনে হলে সে খরচ কমানোর ব্যবস্থা করা যাবে। এই হিসাব সাপ্তাহিক বা সাত দিন পর পর মিলাতে হবে অথবা এক মাস পর পর মিলিয়ে দেখা দরকার।

তারিখ	যাতায়াত	আপ্যায়ন	মজুরি	স্টেশনারি	মোট

ছবি: ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

৬.৩ বিভিন্ন হিসাবরক্ষণের উপায় ও ফর্মা নমুনা কপি

নগদান বই

পৃষ্ঠা নং ..... স্থান ..... জেলা ঃ .....

দল/উদ্যোক্তা .....

ক্রেডিট (জমা)						ডেবিট (খরচ)					
তারিখ	পৃষ্ঠা নং	হিসাবের নাম	বিবরণ	রিসিট নং	পরিমাণ (টাকা)	তারিখ	পৃষ্ঠা নং	হিসাবের নাম	বিবরণ	রিসিট নং	পরিমাণ (টাকা)

স্টক রেজিস্টার:

দল/উদ্যোক্তা .....স্থান..... জেলা ঃ

তারিখ	পৃষ্ঠা নং	দ্রব্যের ধরন/ প্রকৃতি	জমার ব্যালেন্স	বহির্গমনের পরিমাণ (সংখ্যা)	কার নিকট	কি কাজে	ব্যালেন্স	উপকরণ ইস্যুকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর	উপকরণ গ্রহণকৃত ব্যক্তির নাম

ভাউচারঃ

ভাউচার নং .....

দল/উদ্যোক্তা :..... নাম :.....গ্রাম :.....

জেলা:..... তারিখ :.....

নাম:..... ঠিকানা:.....

বিবরণ	পরিমাণ (টাকার অংক)
	এই মর্মে প্রত্যায়ন করছি যে এই ভাউচারে যে পরিমাণ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে তা আমি গ্রহণ করেছি। গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ..... প্রদানকারীর স্বাক্ষর

অধিবেশন

০৮ সহনশীল জীবিকায়নের লক্ষ্যে নেতৃত্ব উন্নয়ন

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে জানবেন ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

৭.১. নেতৃত্ব ও নেতৃত্বের ধরন সম্পর্কে জানবেন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৭.২ নেতৃত্বের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানবেন ও অন্যকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
৭.৩ নেতৃত্বের নতুন ধারণা: প্যারাডাইম শিফট সম্পর্কে জানবেন ও অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৭.৪ সেবক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে জানবেন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৭.৫ নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানবেন ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৭.৬ দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে এবং তা নিরসনের কলাকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৭.৭ ক্ষমতা কাঠামো বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং সরকারি সেবাগ্রহণের কৌশলসমূহ আয়ত্ত করতে পারবেন।

পদ্ধতি

বক্তৃতা, উন্মুক্ত চিন্তা, আলোচনা।

উপকরণ

মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, মাস্কিং টেপ/ডক ক্লিপ।

সময় : ৯০ মিনিট।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া :

আলোচ্য বিষয়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৭.১	• অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন। • পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে (সহায়ক তথ্য ৭.১ অনুযায়ী) নেতৃত্ব ও নেতৃত্বের ধরন সম্পর্কে বর্ণনা করুন। • এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন, কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর বুঝিয়ে বলুন।	২০ মিনিট
৭.২	• নেতৃত্বের প্রকারভেদ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে নেতৃত্বের প্রকারভেদ সম্পর্কে (সহায়ক তথ্য ৭.২ অনুযায়ী) ব্যাখ্যা করুন।	৬০ মিনিট
৭.৩	• পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে 'নেতৃত্বের নতুন ধারণা: প্যারাডাইম শিফট' সম্পর্কে আলোচনা করুন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অংশ ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন আছে কিনা জানতে চান। থাকলে তার উত্তর বুঝিয়ে বলুন।	৫ মিনিট
৭.৪	• পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে প্যারাডাইম শিফট ধারণার সাথে সম্পর্কিত করে সেবক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনার মাধ্যমে বিষয়সমূহের সার-সংক্ষেপ করুন। • আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে শিখন যাচাই করুন। ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।	৫ মিনিট
৭.৫	পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে (সহায়ক তথ্য ৭.৫ অনুযায়ী আলোচনা করুন। অংশগ্রহণকারীদের ৩/৪টি দলে ভাগ করে 'নেতৃত্ব উন্নয়ন কর্মসূচির ধাপ'গুলো ব্যাখ্যা করতে বলুন, (সময়: ১৫ মিনিট)। অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে বড় দলে তা উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনায় সহায়তা করুন। • সবশেষে পুরো অধিবেশন সংক্ষিপ্তাকারে বলুন।	

পাঠ-সহায়ক নেতৃত্ব

৭.১. নেতৃত্ব

নেতৃত্ব এমনই একটি প্রক্রিয়া যা কোনো একটি সমাজ বা সংগঠনকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। অর্থাৎ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিই নেতা বা তার কাজকে নেতৃত্ব বলা হয়ে থাকে। নেতা স্থানীয় সমাজ বা সংগঠনের চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিকে ধারণ করেন, প্রভাবিত করেন ও পরিচালিত করেন। নেতাকে স্থানীয় সমাজ বা সংগঠন প্রভৃতির প্রতিনিধি ও মুখপাত্র নামে অভিহিত করা যায়। নেতৃত্বের মূল বিষয়ই হলো সঠিক ব্যবস্থাপনা ও দলকে সক্রিয় করার মধ্য দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা। এর অর্থ আসলে এই যে অনুসারীরা নেতার দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হবেন এবং লক্ষ্য অর্জনে কাজ করবেন। জন গার্ডনার নেতৃত্ব সম্পর্কে বলেন, "একজন নেতা এমনভাবে তাঁর লক্ষ্যকে লালন করেন ও প্রকাশ করেন যে, জনসাধারণ তাদের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পূর্বধারণার গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ পরিশ্রম করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়।"

নেতৃত্বের ধরন

সমাজবিজ্ঞানীগণ মানব সমাজে নেতৃত্বদানরত বিভিন্ন নেতার বৈশিষ্ট্যের ধরন পর্যালোচনা করে মোটামুটি ছয় ধরনের নেতৃত্বকে চিহ্নিত করেছেন।

ক. ধর্মীয় নেতা: মানব সমাজে প্রচলিত প্রায় সকল ধর্মের একজন মূল নেতা রয়েছেন। যেমন- মুসলমানদের হযরত মুহম্মদ (সাঃ), খ্রিষ্টানদের যীশুখ্রিষ্ট, বৌদ্ধদের বুদ্ধদেব। এঁদের পরেও দেশ ও যুগভেদে ধর্মীয় নেতা থাকেন।

খ. বংশানুক্রমিক নেতা: রাজা, বাদশা, সম্রাট এ ধরনের নেতা। এঁদের বংশধরই পরবর্তী রাজা, বাদশা বা সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হতেন। এখনও পৃথিবীর অনেক দেশেই এ প্রথা বিদ্যমান আছে।

গ. সামাজিক নেতা: সমাজে এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা স্ব-উদ্যোগে এবং বিনা পারিশ্রমিকে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে কাজ করে থাকেন, তাঁরাই সামাজিক নেতা। এদের কেউ কেউ তাদের কাজকে অধিকতর সুসংগঠিত উপায়ে পরিচালনার জন্য সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ. পেশাভিত্তিক নেতা: পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন পেশাভিত্তিক নেতা দেখা যায়। যেমন- দোকান মালিক সমিতির নেতা, হকার সমিতির নেতা প্রভৃতি।

ঙ. গণনেতা বা রাজনৈতিক নেতা: প্রতিটি রাজনৈতিক দলে কিছুসংখ্যক নেতা থাকেন। দলের ব্যাপ্তি অনুযায়ী নেতারও আধিক্য বা স্বল্পতা দেখা যায়। এরা গণমানুষ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে সাংসদ, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির দায়িত্বও পালন করেন। এরা নির্বাচনে পরাজিত হলেও গণনেতা ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখেন।

চ. সাংগঠনিক নেতা: মানব সমাজে বিরাজমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দই সাংগঠনিক নেতা। এনজিওর পরিচালকবৃন্দ, সমাজসেবী ক্লাবের পরিচালকবৃন্দ, সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিচালকবৃন্দ, প্রতিবন্ধী সংগঠনের পরিচালকবৃন্দ, ভূমিহীন দরিদ্র মানুষ কর্তৃক সংগঠিত দলের সভাপতি, সম্পাদকও এমনই নেতা।

৭.২ নেতৃত্বের প্রকারভেদ

গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নেতৃত্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. গণতান্ত্রিক বা অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব

যদিও এ পদ্ধতিতে নেতাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্ত তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল সদস্যের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করেন। কর্মকর্তা বা দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণের এই প্রক্রিয়া শুধু তাদের সন্তুষ্টিই বিধান করে না, তাঁদের কর্মস্পৃহা বাড়ায় এবং কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এ ধরনের নেতৃত্বের অধীনে যেহেতু প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে অংশীদার বিবেচনা করেন, সেহেতু প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের যে কোনো প্রচেষ্টা তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সময় কিছুটা বেশি প্রয়োজন হলেও তা ইতিবাচক ফলাফল অর্জনে অধিক কার্যকর হয়।

খ. এককেন্দ্রিক বা স্বৈরাচারী নেতৃত্ব

এককেন্দ্রিক বা স্বৈরাচারী নেতৃত্বে নেতা তার অনুসারী বা সদস্যদের ওপর ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। দলের অনুসারী ও সদস্যদের মতামত বা সুপারিশ রাখার সুযোগ থাকে না, এমন কি তা যদি দল বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টও হয়। সকল ক্ষমতা নেতার হাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে এবং নেতার নির্দেশই শেষকথা হিসেবে বিবেচিত হয়। এধরনের নেতৃত্বের প্রতি অধিকাংশ সদস্যই অসন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁদের অনেকেই নতুন নেতৃত্বের সন্ধানে প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করেন। এককেন্দ্রিক বা স্বৈরাচারী নেতৃত্বের অধীনে সৃজনশীলতার সুযোগ থাকে না বলে প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে।

https://www.lh3.googleusercontent.com/

গ. আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব

আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব মনে করেন, প্রতিষ্ঠানের নীতিমালাই একমাত্র নির্দেশনা যা জনস্বার্থ, ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা পরিস্থিতি উপেক্ষা করেই বাস্তবায়ন করতে হবে। নিরাপত্তার ঝুঁকি সম্বলিত কাজ- যেমন, যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ, রাসায়নিক বিপজ্জনক পদার্থ নিয়ে কাজ কিংবা টাকা-পয়সার লেনদেন-সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে এই ধরনের নেতৃত্ব বা পরিচালনা পদ্ধতি বেশ কার্যকর। কিন্তু অন্যবিধ ক্ষেত্রে এধরনের নিয়ন্ত্রণ জনগণকে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে উৎসাহিত করতে পারে এবং বাহ্যিক পরিবেশ-সৃষ্ট কোনো পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি মোকাবিলায়ও প্রতিষ্ঠানকে অসামর্থ্য করে তুলতে পারে।

ঘ. মুক্ত নেতৃত্ব

মুক্ত নেতা নেতৃত্ব দেন না, বরং দলকে সম্পূর্ণভাবে তার নিজের গতিতে চলতে দেন। এ ধরনের নেতৃত্ব তার অধস্তনদের সর্বাধিক স্বাধীনতা দেন। প্রতিষ্ঠানের নীতি ও কৌশল স্থির করার ক্ষেত্রে অধস্তনদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়।

https://www.bamradionetwork.com/

৭.৩ নেতৃত্বের নতুন ধারণা: প্যারাডাইম শিফট ইন লিডারশীপ

নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে সেবক নেতৃত্ব একটি নতুন ধারণা। সেবক নেতৃত্ব হচ্ছে একটি ব্যবস্থাপনা দর্শন যা মানুষের যোগ্যতা, কাজ এবং সম্প্রদায়ের উৎসাহের উপর গুরুত্বারোপ করে। এর মাঝে পরিচয়, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং পরিবেশের একটি উৎসাহমূলক উপলব্ধি বিরাজ করে। একজন সেবক নেতা প্রথমে একজন সেবক– নিজ জনগোষ্ঠীর প্রতি যার একটি দায়িত্ব রয়েছে এবং তিনি জনগণের ও জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অবদান রাখেন। একজন সেবক নেতা অন্যের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং নিজেকে প্রশ্ন করেন কীভাবে তিনি তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারেন ও তার পাশাপাশি আত্ম-উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। তার প্রধান শক্তি হচ্ছে জনগণ, কারণ শুধু সংঘবদ্ধ এবং প্রণোদিত মানুষই তাদের লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয় এবং প্রত্যাশা পূরণ করে থাকে।

The Servant as Leader প্রবন্ধে এৎববহষবধভ বলেছেন, সেবক নেতৃত্ব এমন একটা স্বভাবজাত অনুভূতির মাধ্যমে শুরু হয় যখন একজন সেবা প্রদানের লক্ষ্যেই সেবক হতে চায়। তাই সেবক নেতা অন্যান্য নেতাদের চেয়ে ব্যতিক্রম। কারণ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনই তাঁকে নেতৃত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

https://www.media.istockphoto.com/vectors/symbol-of-teamwork-cooperation-partnership-vector

৭.৪ নেতৃত্বের ধরনের ক্ষেত্রে সেবক নেতৃত্ব

নেতৃত্বের ধরনের মধ্যে প্রধান বিভাজন হলো একনায়কতান্ত্রিক ও অংশীদারিত্বমূলক। নেতৃত্বে একনায়কতান্ত্রিক ধরন বলতে বোঝায় সুস্পষ্টভাবে কর্ম-নির্দেশনা দেয়া এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা। সিদ্ধান্ত প্রণয়ন মূলত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহীদের উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সহকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বড় বড় কাজগুলো অনেক বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে থাকে। এতে সহকর্মীদের প্রভাব এবং দায়িত্ববোধও বৃদ্ধি পায়।

সেবক নেতৃত্ব

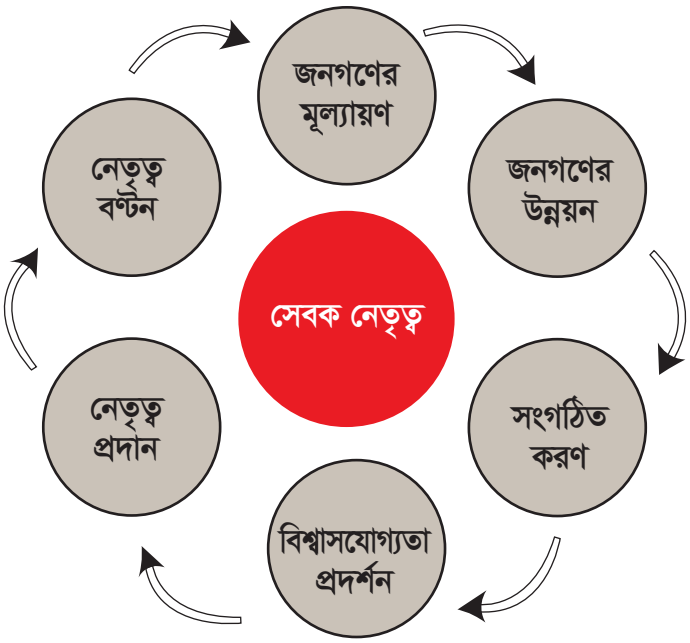

জনগণের উন্নয়ন

সেবক নেতা জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করেন এবং নিজের কল্যাণের কথা চিন্তা না করে বরং নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্যের চাহিদা ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সেবক নেতা সব সময়ই নিজের কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা, সদিচ্ছা, মানুষের কল্যাণের প্রতি আগ্রহ এবং সেবামূলক মানসিকতা দিয়ে মানুষের আনুগত্য অর্জনে সচেষ্ট হন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষের আনুগত্য অর্জন ছাড়া নেতৃত্ব অর্জন সম্ভব নয়।

বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদর্শন

সেবক নেতৃত্ব জনগণের বিশ্বাস অর্জনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কারণ সেবক নেতা বিশ্বাস করেন যে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদর্শন করা না গেলে নেতৃত্ব পাওয়া যায় না।

নেতৃত্ব প্রদান

জনগণের বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হলেই কোনো একজনের পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে তিনি নিজের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস কাজে লাগিয়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে জনগণকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।

নেতৃত্ব গঠন

সেবক নেতা দ্রুত এবং কার্যকরভাবে কার্যসম্পাদনের জন্য যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী অনুসারীদের মধ্যে নেতৃত্বের দায়িত্ব বণ্টন করে থাকেন। ফলে অনুসারীদের নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব পালনে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে পরবর্তী তথা দ্বিতীয় সারির নেতৃত্ব বিকশিত হবে।

জনগণের মূল্যায়ন

জনগণই সেবক নেতার নেতৃত্বের বিষয়টি মূল্যায়ন করে থাকেন। তাই সেবক নেতা সব সময়ই সেবক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ ও চর্চায় সচেষ্ট থাকেন।

সেবক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি:
Larry C. Spears এর মতে সেবক নেতৃত্ব উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সাতটি বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন:

ক. শ্রবণ আগ্রহ: ঐতিহ্যগতভাবে সেবক নেতৃত্বে নেতাকে যোগাযোগের দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে হয়। একজন সেবক নেতৃত্বকে তার অধীনস্থদের কথা শোনা এবং তাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সাহায্য করতে হয়। সেবক নেতাকে খুব গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন নেতৃত্বের ব্যাপারে কোনো বিষয়ে ঘাটতি না থাকে।

খ. সহমর্মিতা: একজন সেবক নেতার অন্যকে বুঝার মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতা থাকতে হবে এবং তাকে সহমর্মী হতে হয়। অনুসারীরা শুধু কর্মী নয় বরং মানুষ হিসেবে তাদের সম্মান এবং আত্ম-উন্নয়নের স্বীকৃতি দিতে হবে।

গ. সমস্যা সমাধানে আগ্রহী: সেবক নেতার অন্যতম গুণ হলো নিজের ও অন্যের সমস্যা নিরসন করা। একজন সেবক নেতা অন্যের সমস্যার সমাধান এবং শত্রুকে বন্ধুত্বে পরিণত করার চেষ্টা করেন, কারণ তিনি প্রতিটি ব্যক্তির আত্ম-উন্নয়নের লক্ষ্যে চেষ্টা এবং উৎসাহ প্রদান করে থাকেন।

গ. সচেতনতা: একজন সেবক নেতৃত্বের মধ্যে সাধারণ সচেতনতা বিশেষ করে আত্মসচেতনতা থাকতে হয়। তাঁর কোনো ঘটনাকে অনেক বেশি বিস্তৃত ও সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ক্ষমতা থাকতে হয়। যার ফলে তিনি নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারেন।

ঘ. প্রণোদনা দানের ক্ষমতা: একজন সেবক নেতা অন্যের সিদ্ধান্তকে তার ক্ষমতা কিংবা অবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত করে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেন না বরং তিনি তার অধীনস্থ সবাইকে বুঝানোর চেষ্টা করে থাকেন। এই গুণটি সেবক নেতৃত্বকে অন্যান্য নেতৃত্বের ধরন যেমন একনায়কতন্ত্র ধারণা থেকে আলাদা করে তোলে।

ঙ. চিন্তাশীলতা: একজন সেবক নেতা দৈনন্দিন বাস্তবতার বাইরেও চিন্তা করে থাকেন, তার মানে কোনো ব্যবস্থাকে স্বীয় সীমাবদ্ধতার বাইরে চিন্তা করা এবং ঐ ব্যবস্থার দূরবর্তী ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা করার ক্ষমতাও একজন সেবক নেতার মাঝে বিদ্যমান থাকে।

চ. দূরদর্শিতা: দূরদর্শিতা হলো এমন একটি ক্ষমতা যেখানে কোনো একটি অবস্থার ফলাফলকে আগে থেকেই অনুধাবন করা হয়। একজন সেবক নেতার অতীত থেকে শিক্ষা নেয়া এবং বর্তমান বাস্তবতা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখার পাশাপাশি ভবিষ্যত ফলাফল সম্পর্কে ধারণা বা চিন্তা করতে পারার সক্ষমতাকে বুঝায়।

৭.৫ নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রক্রিয়া

প্রাতিষ্ঠানিক বা দলীয় সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি হলো ব্যতিক্রমধর্মী নেতৃত্ব। যে সকল প্রতিষ্ঠান সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছে তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের বা দলের ভেতরে নেতৃত্ব উন্নয়নের চেষ্টা করেছে এবং দক্ষতার সাথে উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হয়েছে। আর অন্যদিকে যে সকল প্রতিষ্ঠান নেতৃত্ব উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দেয়নি তারা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে; প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার সামর্থ্য হারিয়েছে। সফল প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু যে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটায় তাই নয় বরং সকল পর্যায়ের নেতা ও কর্মীদের নেতৃত্বেরই উন্নয়ন সাধন করে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন স্তরে পাওয়া যায় বেশ কিছু অসাধারণ নেতা যাঁরা প্রতিষ্ঠান বা দলের সকল কর্মীদের নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনের জন্য আন্তরিক থাকেন।

সফল প্রতিষ্ঠান সব সময়ই নেতৃত্বের সঠিক মূল্যায়ন করে এবং প্রতিষ্ঠান ও দলের ভিতরে এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলে যেখানে নেতৃত্ব তৈরি ও নেতৃত্বের বিকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোর জন্য সক্রিয়ভাবে সময় দেয় এবং অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করতেও কোনো কার্পণ্য করে না। যে সকল প্রতিষ্ঠান সফলতার চরম শিখরে পৌঁছায় তাদের রয়েছে ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি। সেই ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নেতৃত্ব পর্যায়ে যারা আছেন তারা শুধু ব্যবস্থাপনার কাজ করেন না বরং সকল স্তরে তারা তাদের নেতৃত্বের জন্য জবাবদিহিও করেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও সফল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো সকল স্তরের নেতৃত্বের গুণাবলীর পার্থক্য যা প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতির এক বিশেষ অংশ। তাই প্রতিষ্ঠানের সফলতার জন্য কিছু নেতা তৈরিই যথেষ্ট নয় বরং সেই নেতাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে, তারা সকল স্তরে তাদের নেতৃত্বের জবাবদিহিতায় বাধ্য থাকবেন। আর দলের সফলতার জন্য এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু ভালো ব্যবস্থাপক বা পরিচালক আছে ঠিকই, কিন্তু ভালো নেতা নেই বা সেই ব্যবস্থাপকের মধ্যে সঠিক নেতৃত্বের গুণাগুণ নেই। তবে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানসমূহ বুঝতে শিখেছে যে, ব্যবস্থাপক আর নেতার মধ্যে পার্থক্য আছে। সহজভাবে বলতে চাইলে বলা যায়, ব্যবস্থাপক বা পরিচালক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তার প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত। আর নেতা হলেন তিনি যিনি প্রশিক্ষক, পরামর্শদাতা এবং তার অধীনস্থদের অনুপ্রাণিত ও উন্নয়ন সাধনে সক্ষম।

আরো দেখা যায়, যারা নেতার আসনে বসে আছেন তারা আসলে কারো কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য নন যদিও এই জবাবদিহিতা নেতার গুণাবলি দৃঢ় করতে সহায়তা করে। নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনের জন্য সঠিক বা সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। Ulrich, Zenger এবং Smallwood “Result Based Leadership” বইয়ে লিখেছেন কিভাবে একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান তাদের অভ্যন্তরীণ সকল স্তরে নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

- প্রথমত, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তারা তাদের দলের নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধন করবেন।
- দ্বিতীয়ত, তারা খুঁজে বের করেছেন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব।
- তৃতীয়ত, তারা নেতৃত্বের মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। এই মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছিল বিশ্বের সফল নেতাদের গুণাগুণ পর্যালোচনা করে।

৫. নেতৃত্ব উন্নয়নের পদ্ধতি এবং কৌশল

ভালো নেতৃত্ব কর্তৃত্বের ধারণার চেয়ে গভীর মানবিক গুণাবলীর উপর বেশি গুরুত্বারোপ করে। আধুনিক যুগে ভালো নেতৃত্ব বলতে এমন একটি শক্তিকে বুঝায় যা ব্যক্তি বা সংগঠনের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে। ফলশ্রুতিতে জনগণের চাহিদা এবং ঐ সমস্ত সংগঠনের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে একটি আধুনিক জোট গড়ে উঠে। নেতৃত্বের প্রথাগত সংজ্ঞা যেখানে নেতৃত্বকে একটি সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দেয়া হয়, যা আজকাল ভালো নেতৃত্বের সংজ্ঞার কাছে খুবই অগ্রহণযোগ্য।

কার্যকরী নেতৃত্ব বলতে শুধুমাত্র দক্ষ কারিগরি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাকে বুঝায় না বরং এগুলো ভালো নেতৃত্বের কাজে সাহায্য করে থাকে। আধুনিক যুগে ভালো নেতৃত্ব বলতে বুঝায় নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবহার যা মানবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেবা প্রদান করা হচ্ছে নেতৃত্বের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যেখানে ভালো নেতৃত্ব তার অধীনস্থ সকল ব্যক্তি এবং সংগঠনকে সেবা প্রদান করে, সেখানে অকার্যকরী নেতৃত্ব সাধারণত এই সেবা প্রদান করাকে উপেক্ষা করে এবং তারা এই নীতিতে বিশ্বাস করে যে জনগণ নেতৃত্বের সেবা করবে। তাদের কাছে নেতৃত্ব হচ্ছে একটি সুযোগ যার মাধ্যমে একজন নেতা অন্যের দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত অবস্থান এবং সুযোগ-সুবিধা অর্জন করে।

অথচ প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব হচ্ছে এমন একটি সুযোগ যার মাধ্যমে জনগণ এবং সংগঠনের সেবা করা হয়। Robert K Greenleaf (১৯৭০ সালে The Servant as Leader নামক প্রবন্ধে) আধুনিক যুগের “সেবকের নেতা” এবং “সেবকের নেতৃত্ব” ধারণাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন নেতৃত্বের ধারণাটি হচ্ছে এমন একটি দর্শন যা সেবা পাওয়ার লক্ষ্যের পরিবর্তে অন্যকে সেবা করার লক্ষ্যে গঠিত হয় এবং এটি খুবই প্রাচীন একটি ধারণা যা বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতা এবং ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে। নেতৃত্ব হচ্ছে জনগণকেন্দ্রিক একটি ধারণা। যদিও নেতৃত্ব অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে এবং কাজের ব্যাপারেও ব্যাখ্যা প্রদান করে। জীবনের অনেক যোগ্যতাই দক্ষতা এবং জ্ঞান আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা উপযুক্ত পরিবেশের সাথে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব একটু ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। ভালো নেতৃত্ব বলতে বোঝায় আবেগজনিত শক্তি এবং ব্যবহারজনিত বৈশিষ্ট্য যা একজন নেতৃত্বের মানসিক এবং আত্মিক শক্তিতে বিদ্যমান থাকে। নেতৃত্বের ভূমিকা হচ্ছে আধুনিক সমাজের জনগণের চাহিদা এবং সমস্যার একটি প্রতিফলন। তাই নেতৃত্ব হচ্ছে খুবই গভীর একটি ধারণা যা দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অনেক জটিল বিষয়াবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে। সাধারণত নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনাকে একইভাবে দেখা হয় যা প্রকৃতপক্ষে সঠিক নয়। নেতৃত্ব সম্বন্ধে আরও একটি ভুল ধারণা হলো, এই যে নেতৃত্ব হচ্ছে এমন একটি সত্তা, যা জনগণকে আদেশ এবং নির্দেশনা দিয়ে থাকে এবং কোনো সংস্থার পক্ষ থেকে নিজে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো প্রণয়ন করে থাকে। কিন্তু কার্যকরী নেতৃত্ব তার চেয়ে বেশি কিছু নির্দেশ করে।

নেতৃত্ব উন্নয়ন কর্মসূচির ধাপ

নৈতিকতা ও নেতৃত্ব

নৈতিকতা ও নেতৃত্ব বিষয়ক আলোচনায় সর্বাগ্রে যে বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে তা হচ্ছে- নৈতিকতা কী? নৈতিকতা শব্দটি যে কোনো সমাজে কিংবা প্রতিষ্ঠানেই বহুল প্রচলিত এবং আমরা প্রায়শই নিজ জনগোষ্ঠীর সদস্য, প্রতিষ্ঠানের সদস্য বিশেষত নেতৃত্বের কাছ থেকে আশা করা হয়ে থাকে। নৈতিক গুণসম্পন্ন নেতা একজন ব্যক্তিমাত্র নন, তিনি তার চেয়েও অধিক, যিনি গোটা প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ধারণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক কাজটিই করেন।

এখন জানা দরকার নৈতিকতা কী?

"নৈতিকতা" শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে থাকে। কোন কাজটি নৈতিক এবং কোনটি নৈতিক নয় এই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো নিয়ম নেই এবং নৈতিকতা ও অনৈতিকতা সংজ্ঞায়িত করা খুব সহজ ব্যাপারও নয়। নৈতিকতা শব্দটি ব্যাখ্যার মূল সমস্যা হচ্ছে, দেশভেদে এমনকি একই দেশে অঞ্চলভেদে আবার একটি দেশ বা অঞ্চলের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে সময়ভেদে নৈতিকতার ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন- প্রাচীনকালে জাপানে অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি দায়-দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে সন্তানেরা তাদেরকে বরফাবৃত পাহাড়ে রেখে আসতো এবং সেখানেই তারা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এবং খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করতেন। আমাদের দেশে এমন কি পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই চূড়ান্ত সমস্যাসংকুল সময়েও এধরনের কাজ অনৈতিক বলেই বিবেচিত। আবার সময়ের ব্যবধানে জাপানে এই প্রথা পরিবর্তিত হয়েছে। নৈতিকতার সহজ ও সর্বোত্তম অর্থ হচ্ছে "সততা"। নৈতিকতা আধুনিক অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান অনুসারে- "নৈতিকতা যা নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত অথবা জ্ঞানের ঐ শাখা যা নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে কাজ করে।"

নৈতিকতা ও নৈতিক নেতৃত্ব

নেতা একদিকে নৈতিক কাজটি করে প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখেন, সংগঠনে এমন এক পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখেন যেখানে প্রতিষ্ঠানের অপরাপর সদস্যবৃন্দও নৈতিক কাজটি করে প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারেন। অর্থাৎ নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নেতার ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড অপরাপর সদস্যবৃন্দকেও সঠিক কাজটি করতে অনুপ্রাণিত করে। নেতা একদিকে নৈতিক কাজটি করে প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখেন, সংগঠনে এমন এক পরিবেশ তৈরি করতে অবদান রাখেন, যেখানে প্রতিষ্ঠানের অপরাপর সদস্যবৃন্দও নৈতিক কাজটি করে প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারেন এবং নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নেতার ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড অপরাপর সদস্যবৃন্দকেও সঠিক কাজটি করতে অনুপ্রাণিত করে। নৈতিক নেতৃত্ব সর্বদাই সততা, ন্যায়বিচার অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের প্রতীক।

একজন নৈতিক গুণসম্পন্ন নেতা হতে চাইলে নিজের সম্পর্কে এ প্রশ্নগুলো করে দেখতে হবে:

১. আমি কি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছি?
২. আমি কি প্রতিষ্ঠানের আইন অনুযায়ী সকলের প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে সুবিচার করছি?
৩. আমি কি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সকলের কর্ম-উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখছি?
৪. আমি কি নৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছি?
৫. আমি কি সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী অংশের অন্যায় মতামত উপেক্ষা করে নির্মোহ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম?
৬. আমার কর্মকাণ্ড কি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সংখ্যালঘিষ্ঠ ও পিছিয়ে পড়া অংশের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে আঘাত করছে?
৭. আমি কি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের সাথে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও পিছিয়ে পড়া অংশের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি?
৮. আমি কি প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগতভাবে সৎ?
৯. আমি কি আত্মমূল্যায়ন করতে সক্ষম এবং আত্মমূল্যায়নে অধীনস্থদের মতামত মূল্যায়ন করি?
১০. আমি কি প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু করছি যা অনুকরণীয়?

নেতৃত্বে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা

সামাজিক সংগঠনসমূহে যে কোনো ইস্যুতে সংগঠনের সদস্যদের মাঝে দ্বিমত বা বহুমত দেখা দিতে পারে। কোনো ইস্যুতে সংগঠনের সদস্যদের মাঝে দ্বিমত বা বহুমত দেখা দিলে নেতার উচিত সৃষ্ট মতানৈক্যকে ঐকমত্যে রূপান্তর করা। মতানৈক্যকে ঐকমত্যে রূপান্তর করতে ব্যর্থ হলেই দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত, সামাজিক, সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক ইস্যুতে হতে পারে। "দ্বন্দ্ব" যে কোনো সংগঠনের জন্যই অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি উপাদান। এজন্য দলের নেতৃত্বের উচিত কোনো ইস্যুতে সৃষ্ট মতানৈক্য যেন মতৈক্যে রূপান্তরিত হওয়ার পরিবর্তে দ্বন্দ্বে পরিণত না হয়। আবার নেতৃত্বের অদূরদর্শী, অপরিণামদর্শী বা অপরিণত সিদ্ধান্ত কিংবা তৎপরতার কারণেও দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সংগঠনের কর্মীর উপরোল্লিখিত ভূমিকার কারণেও দলে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে।

দ্বন্দ্ব কী?

যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ঐকমত্যে না পৌঁছানো অথবা ভিন্নমত পোষণ এবং ঐক্যবদ্ধ মতের পরিবর্তে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টাই দ্বন্দ্ব।

দলে দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট সমস্যা

প্রথমেই জানা যাক, কোনো দলে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে কি কি সমস্যা হতে পারে:

১. সংগঠনের ঐক্য বা দৃঢ়তা হ্রাস পায়।
২. সংগঠনের সদস্যদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি, অনৈক্য ও অনাস্থা দেখা দেয়।
৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়।
৪. সংগঠনের কার্যক্রম গ্রহণ/বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।
৫. সংগঠনের বাইরে সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৬. সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়।
৭. সংগঠন ভেঙে যেতে পারে।

দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশল ও প্রক্রিয়া

দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশলের পূর্বকথা হচ্ছে, উপরোল্লিখিত যে সকল কারণে দ্বন্দ্ব হয় তা এড়িয়ে চলা, পরিত্যাগ করা ও সংঘটিত হতে না দেয়া। এরপরও যদি কোনো কারণবশত সংগঠনের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলে দলের ঐক্য, সংহতি ও কার্যকারিতার স্বার্থে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব দীর্ঘায়িত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসন করা উচিত।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন: দ্বন্দ্ব নিরসন করবেন কে?

উত্তর : দ্বন্দ্ব যদি হয় দুজনের ব্যক্তিগত, তাহলে নেতা দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তা সমাধানের চেষ্টা করবেন। এ প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে দ্বন্দ্বটি দ্বিপাক্ষিক হলেও সাংগঠনিক সভায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরসনের উদ্যোগ নেয়া উচিত। তবে দ্বন্দ্বটি যদি বহুপাক্ষিক বা সাংগঠনিক কারণ থেকে উদ্ভূত দ্বিপাক্ষিক হয় তাহলে তা সাংগঠনিক সভাতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই নিরসনের উদ্যোগ নেয়া উচিত।

দ্বন্দ্ব নিরসন প্রক্রিয়া

১. নেতাকে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।
২. দ্বন্দ্বের পক্ষসমূহকে দ্বন্দ্ব নিরসনের সত্যিকারের সদিচ্ছা থাকতে হবে।
৩. দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে সভায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
৪. পক্ষসমূহ স্বীয় মতামত তুলে ধরবেন।
৫. উপস্থিত সকলকে বিশেষত নেতা দ্বন্দ্বের প্রকৃত কার্যকারণ অনুধাবন করবেন ও তা ব্যক্ত করবেন।
৬. দ্বন্দ্বের কার্যকারণের আলোকে উপস্থিত সকলে দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।

দ্বন্দ্ব নিরসনে জয়-জয় অবস্থা (Win Win Situation)

উইন উইন নেগোসিয়েশন বা জয় জয় সমঝোতা কী?

যে কোনো ইস্যুতেই ব্যক্তি এবং সংগঠন নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে সাধারণত নিজ নিজ অর্জনের দিকটিই দেখতে চায়। কিন্তু এর ফলে অন্য ব্যক্তি বা সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর দরুন ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়া স্বাভাবিক, যা সকল পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এমন এক অবস্থা প্রয়োজন, যা কোনো একটি ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্যই সুবিধাজনক। ইংরেজি শব্দ Negotiation ও Compromise কখনো কখনো আমাদের মধ্যে অর্থগত বিভ্রান্তি তৈরি করে; প্রকৃতপক্ষে শব্দ দু'টি বাংলা ভাষায় ভিন্ন এক ব্যঞ্জনা তৈরি করে। প্রকৃতপক্ষে নেগোসিয়েশন "কমপ্রোমাইজ বা আপোষ" লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। তত্ত্বগতভাবে উইন উইন নেগোসিয়েশন বা জয় জয় সমঝোতা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ এমন এক মতৈক্য বা চুক্তিতে পৌঁছায়, যার দ্বারা সকল পক্ষই অন্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করেই নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়তাও করে। উইন উইন নেগোসিয়েশন বা জয় জয় সমঝোতা একটি প্রক্রিয়া, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্জিত হয় ডায়ালগের মাধ্যমে। ডায়ালগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্য দিয়ে মতপার্থক্য হ্রাস, কোনো অমীমাংসিত বিষয়ে ঐকমত্য সৃষ্টি এবং ঐকমত্যের মাধ্যমে এমন এক ফলাফল বের করে আনার চেষ্টা করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কার্যক্রম পরিচালনা ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয়।

ছবি: ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

অধিবেশন

০৯ নগর-বস্তিতে সরেজমিন জীবিকায়ন পর্যালোচনা

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে জানবেন ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

৯.১ নগর-বস্তিতে বসবাসকারী অধিবাসীবৃন্দের নগরে অভিগমনের কারণ, উপার্জনমুখী দক্ষতা ও পারিবারিক আয়।
৯.২ নগর-বস্তিতে বসবাসকারী অধিবাসীবৃন্দের জীবিকায়নের ধরন ও জীবিকায়ন ঝুঁকি।
৯.৩ নগর-বস্তিতে বসবাসকারী অধিবাসীবৃন্দের জীবিকায়নের ঝুঁকি হ্রাসে তাদের অভিমত।

পদ্ধতি
বক্তৃতা, উন্মুক্ত চিন্তা, সরেজমিন পরিদর্শন, আলোচনা।

উপকরণ
মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, মাস্কিং টেপ/ডক ক্লিপ।

সময় : ৪ ঘণ্টা।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া :

আলোচ্য বিষয়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৯.১	• অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন। • সহায়ক অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। • তিনি প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে ৩টি দলে বিভক্ত করে প্রতিটি দলের নেতা নির্ধারণ করার জন্য বলবেন। তাদেরকে সরেজমিন পরিদর্শনকালে কার্যক্রমসমূহ বুঝিয়ে দিবেন। কার্যক্রমসমূহ হবে নিম্নরূপ: - ফোকাস গ্রুপ আলোচনা - ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার - সামগ্রিক অবস্থা পরিদর্শন • প্রতিটি দলের জন্য পূর্বে প্রস্তুতকৃত চেকলিস্ট ব্যাখ্যা করবেন, অংশগ্রহণকারীবৃন্দের প্রশ্নের উত্তর দিবেন।	৩০ মিনিট
৯.২	• দলসমূহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিকটস্থ কোনো নগর বস্তি পরিদর্শন করবেন। সহায়কদ্বয় প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে থেকে তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন। দলসমূহ নির্ধারিত কাজ, যথা: ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার, সামগ্রিক অবস্থা পরিদর্শন করবেন। প্রয়োজনীয় নোট নিবেন।	২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট (ভ্রমণসহ)
৯.৩	• দলসমূহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফিরে এসে নিজ নিজ দলের প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। দলসমূহ প্লেনারিতে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন। সহায়ক এই অধিবেশন পরিচালনা করবেন। দলীয় উপস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন। সবশেষে সহায়ক ৩ দলের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ আলোচনা করবেন।	১ ঘণ্টা

অধিবেশন

১০ অ্যাডভোকেসি

উদ্দেশ্য
অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে জানবেন ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

১০.১ অ্যাডভোকেসি ইস্যুতে সরকারের করণীয়
১০.২ অ্যাডভোকেসি প্রচারাভিযান বা ক্যাম্পেইন পকিল্পনা
১০.৩ অ্যাডভোকেসি কী ও অ্যাডভোকেসি ধারণা নিয়ে দ্বন্দ্ব বা বিভ্রান্তি
১০.৪ সহযোগী সংগঠন চিহ্নিত করা ও এলায়েন্স গঠন
১০.৫ অ্যাডভোকেসি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি

পদ্ধতি
বক্তৃতা, উন্মুক্ত চিন্তা, আলোচনা।

উপকরণ
মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, মাস্কিং টেপ/ডক ক্লিপ।

সময় : ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া :

আলোচ্য বিষয়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৯.১	• অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করুন। • সহায়ক অ্যাডভোকেসি আলোচনার সূত্রপাত করুন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানতে চান, প্রয়োজনে তাদের মতামত বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। পুনঃপুন প্রশ্ন করে তাদের বিদ্যমান ধারণা কতটুকু সঠিক তা যাচাই করুন। এবারে পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে অ্যাডভোকেসি সংজ্ঞা আলোচনা করুন। অ্যাডভোকেসি ধারণা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব বা বিভ্রান্তি সাধারণত দেখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করুন ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলের কাছে তা পরিষ্কার করুন। • এই অধিবেশনেই অ্যাডভোকেসির প্রকারভেদ নিয়েও আলোচনা করুন। • অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন আছে কিনা জানতে চান। থাকলে তার উত্তর বুঝিয়ে বলুন এবং অধিবেশন সমাপ্ত ঘোষণা করুন।	৬০ মিনিট
৯.২	• দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সরকারের করণীয় ইস্যুতে আলোচনার সূত্রপাত করুন। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সরকারের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বা আইনগত অবস্থান অংশগ্রহণকারীদেরকে বলতে বলুন, তাদের মতামত বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। ঘাটতি থাকলে পূর্বে প্রস্তুতকৃত পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলের কাছে তা পরিষ্কার করুন। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সরকারের আইনগত অবস্থান ছাড়াও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সরকার যেভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলকে জানান। • এবারে অংশগ্রহণকারীদেরকে ৩ ভাগে ছোট দলে বিভক্ত করে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে এনজিও/সিবিওসমূহের করণীয় কী তা নির্ধারণের দায়িত্ব দিন (সময় ৩০ মিনিট)। নির্ধারিত সময় শেষে প্রতিটি দল স্বতন্ত্রভাবে পূরণকৃত ফর্ম বা 'ব্যবসায় পরিকল্পনা' বড় দলে উপস্থাপন করবেন। সহায়ক হিসেবে উপস্থাপনায় সহায়তা করুন এবং ছোট দলে আলোচনার ফলাফল সার-সংক্ষেপ করুন। সবশেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিন এবং অধিবেশন সমাপ্ত ঘোষণা করুন।	৬০ মিনিট

৯.৩	• অ্যাডভোকেসি প্রচারাভিযান বা ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা একটি পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত কার্যক্রম। অধিবেশনের শুরুতে অ্যাডভোকেসি প্রচারাভিযান বা ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেরকে ধারণা দিন। অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিন। • পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে পূর্বে প্রস্তুতকৃত 'অ্যাডভোকেসি প্রচারাভিযান বা ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা' (সহায়ক তথ্য ৯.৩ অনুযায়ী) ব্যাখ্যা করুন। • এবারে অংশগ্রহণকারীদেরকে ৩ ভাগে ছোটো দলে বিভক্ত করে তাদেরকে যে কোনো একটি ইস্যু দিন; (যেমন: বস্তির ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিদ্যুৎ ব্যবহারের অনুমতি সংগ্রহ)। নির্ধারিত ইস্যুতে অংশগ্রহণকারীদের ৩টি ছোট দলকে 'অ্যাডভোকেসি প্রচারাভিযান বা ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা' প্রণয়নের দায়িত্ব দিন (সময় ৬০ মিনিট)। নির্ধারিত সময় শেষে প্রতিটি দল স্বতন্ত্রভাবে দলীয় কাজ বড় দলে উপস্থাপন করবেন। সহায়ক হিসেবে উপস্থাপনায় সহায়তা করুন, ৩টি দলের দলীয় কাজের ফলাফলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন। • ছোট দলে আলোচনার ফলাফল সার-সংক্ষেপ করুন। সবশেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিন এবং অধিবেশন সমাপ্ত ঘোষণা করুন।	২ ঘণ্টা
৯.৪	• অধিবেশনের শুরুতে অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে অ্যাডভোকেসিতে 'সহযোগী সংগঠন চিহ্নিত করা ও এলায়েন্স গঠন' সাধারণ সম্পর্কে ধারণা দিন। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন আহ্বান করুন ও যথার্থ উত্তর দিন। • এবার পূর্বে প্রস্তুতকৃত পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে অ্যাডভোকেসিতে সহযোগী সংগঠন চিহ্নিত করা ও এলায়েন্স গঠন প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করুন। • সবশেষে আলোচনার ফলাফল সার-সংক্ষেপ করুন ও ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত ঘোষণা করুন	৬০ মিনিট
৯.৫	• ইস্যু নির্বাচন, অ্যাডভোকেসি প্রচারাভিযান বা ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা ও সহযোগী সংগঠন চিহ্নিত করা ও এলায়েন্স গঠন পর্বের পরে অ্যাডভোকেসি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। • পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে অ্যাডভোকেসি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরির ছকটি দেখান। পূর্বের ছোট দলসমূহকে (৩টি) পূর্বের ইস্যুতেই দলীয় আলোচনার মাধ্যমে 'অ্যাডভোকেসি কর্ম-পরিকল্পনা' তৈরির দায়িত্ব প্রদান করুন (সময় ৩০ মিনিট)। নির্ধারিত সময় শেষে প্রতিটি দল স্বতন্ত্রভাবে দলীয় কাজ বড় দলে উপস্থাপন করবেন। সহায়ক হিসেবে উপস্থাপনায় সহায়তা করুন, ৩টি দলের দলীয় কাজের ফলাফলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন। ছোট দলে আলোচনার ফলাফল সার-সংক্ষেপ করুন। সবশেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিন এবং অধিবেশন সমাপ্ত ঘোষণা করুন। • সবশেষে গোটা দিনের আলোচনার সার-সংক্ষেপ পুনরায় আলোচনা করুন।	৩০ মিনিট

অ্যাডভোকেসি কী?

যে কোনো ইস্যুতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কোন কৌশল অনুসরণ করা হবে এবং এর ফলে কী অর্জিত হবে– তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাই নীতি। পক্ষান্তরে জননীতি বা পাবলিক পলিসি বলতে সেই সকল নীতিকেই বোঝানো হয়, যা জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এবং সরকার দ্বারা প্রণীত। এটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রণীত হয় এবং মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদিত হতে হয়। পাবলিক পলিসি সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির আইনি দলিল, যে দলিলে সরকারের দর্শন, মূল্যবোধ ও অঙ্গীকার কোন্ কৌশলে বাস্তবায়িত হবে তার দিক-নির্দেশনা থাকে। পাবলিক পলিসি বা জননীতি সরকারের কোনো না কোনো আইন দ্বারা সমর্থিত হতে হয়।

অ্যাডভোকেসি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যা প্রান্তিক ও অধিকারবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার পরিবর্তন ও সংস্কার করে অথবা এর বাস্তবায়নের পথ সুগম করে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক ও অধিকারবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট থাকা প্রয়োজন, যা তাদের ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করে; তাদেরকে ভাবতে শেখায় যে তারা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অনুঘটক এবং তারাও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের দরুন দারিদ্র্যায়নের অন্তর্নিহিত কারণই শুধুমাত্র উদ্‌ঘাটিত হয় না, দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াও সূচিত হয়।

অ্যাডভোকেসি সংজ্ঞা

অ্যাডভোকেসি'র বাংলা প্রতিশব্দ অধিপরামর্শ। তবে শব্দটি এখনো বহুল প্রচলিত নয়, বরং অ্যাডভোকেসিই এক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত পরিভাষা। অ্যাডভোকেসি প্রসঙ্গে প্রকৃত ধারণা লাভের পূর্বে কতিপয় বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা অধ্যয়ন করা যেতে পারে। আফ্রিকাভিত্তিক আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের জোট (ক্রিস্টিয়ান এইড, একশনএইড, এস ও এম ও, এ পি এম ডি ডি, নরওয়েজিয়ান চার্চ এইড) ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক অ্যাডভোকেসিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছে, অ্যাডভোকেসি হচ্ছে এমন কতিপয় কার্যক্রমের সম্মিলিত রূপ যার মাধ্যমে সংগঠন ও ব্যক্তিসমষ্টি নির্দিষ্ট নীতিমালা অথবা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন (যেমন- বিশ্বব্যাংক বা আই এম এফ) অথবা ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ (যেমন- কোনো শহরের মেয়র) পরিবর্তনের লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি করে। অ্যাডভোকেসি সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়াও হতে পারে যা দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক সম্পর্ক, ক্ষমতা সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, সুশীল সমাজকে শক্তিশালী করে এবং গণতন্ত্রের পথও সুগম করে। চূড়ান্ত অর্থে অ্যাডভোকেসির দরুন সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণ উদ্‌ঘাটিত হয়, সমাধানে পৌঁছানোর পথে বাধাসমূহ অপসারণ করে এবং কাঙ্ক্ষিত পারিবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় এজেন্ডাসমূহকে সফলভাবে প্রভাবিত করা যায়।

আন্তর্জাতিক এনজিও ওয়াটারএইডের মতে, অ্যাডভোকেসি হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন প্রক্রিয়া। অ্যাডভোকেসি সুনির্দিষ্ট ইস্যুভিত্তিক হতে হবে এবং এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে। অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম জাতীয় এমন কি আন্তর্জাতিক নীতিমালা পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ স্থানীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত যেন তা ভুক্তভোগী মানুষের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখে এবং এর ফলে তারাও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম রাজনৈতিক এবং ক্ষমতা কাঠামো ও ক্ষমতা সম্পর্ক সংশ্লিষ্টও হতে হবে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করে অ্যাডভোকেসি প্রসঙ্গে, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, অ্যাডভোকেসি হচ্ছে এমন একটি পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যা প্রান্তিক ও অধিকারবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা পরিবর্তন ও সংস্কার করে অথবা এর বাস্তবায়নের পথ সুগম করে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক ও অধিকারবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট থাকা প্রয়োজন যা তাদের ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করে, তাদেরকে ভাবতে শেখায় যে তারা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অনুঘটক এবং তারাও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম স্থানীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত কিন্তু নীতি সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করেই অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের কৌশল তৈরি করা উচিত। অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের দরুন দারিদ্র্যায়নের অন্তর্নিহিত কারণই শুধুমাত্র উদ্‌ঘাটিত হয় না, দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সূচিত হয় এবং অন্যায্য ও বৈষম্যযুক্ত ক্ষমতাকাঠামো ও ক্ষমতা সম্পর্কের প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর স্বপক্ষে পরিবর্তন সূচিত হয়। তবে এটা ভাবা ঠিক নয় যে, অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম সাংঘর্ষিক। সরকারের সিদ্ধান্ত প্রণেতা এবং স্থানীয় পর্যায়ে এর বাস্তবায়নকারীগণও কখনো কখনো অনুভব করেন যে, নীতিমালা কিংবা এর বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমস্যা রয়েছে এবং এর জন্য মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। একই সাথে কখনো কখনো জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তারা বিকল্প সমাধানও শুনতে চান। অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে হতে পারে, সমস্যার প্রকৃতি অনুসারে এর ধরনও ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে। অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে রয়েছে, গবেষণা, লবিং, প্রচারণা, জোট গঠন, জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা ইত্যাদি।

'জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, ব্যবস্থা ও প্রথাকে প্রভাবিত করার সমন্বিত, সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই হচ্ছে অ্যাডভোকেসি।' সমাজ পরিবর্তনের ধারায় অ্যাডভোকেসি আজ এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ও উন্নয়ন পন্থা। বিশেষ করে, এটি বঞ্চিত, অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া মানুষের দাবি প্রতিষ্ঠা করার শক্তিশালী কৌশল। মানুষের ক্ষমতায়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক সরকার ও সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম দিন দিন সভ্যসমাজে সমাদৃত হয়ে উঠেছে।

অ্যাডভোকেসির প্রকারভেদ

অ্যাডভোকেসি পরিচালনা দলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অ্যাডভোকেসিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. সুশীল সমাজকেন্দ্রিক অ্যাডভোকেসি ও
খ. জনগোষ্ঠীভিত্তিক অ্যাডভোকেসি।

ক. সুশীল সমাজকেন্দ্রিক অ্যাডভোকেসি: সুশীল সমাজকেন্দ্রিক অ্যাডভোকেসিতে প্রাগ্রসর নাগরিক সমাজ, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও সামাজিক সংগঠনসমূহ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিশেষত নতুন নীতি প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইন/নীতিমালা সংস্কারের ক্ষেত্রে অথবা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এই ধরনের অ্যাডভোকেসি অবদান রাখে। আমাদের দেশে এমন কি গোটা বিশ্বেই সুসংগঠিত সুশীল সমাজকেন্দ্রিক অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম সংখ্যার বিচারে সর্বাধিক। সুশীল সমাজকেন্দ্রিক অ্যাডভোকেসির মধ্য দিয়ে কখনো কখনো অধিকারবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নও হয়ে থাকে।

সারা বিশ্বেই বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাংলাদেশেও বহুসংখ্যক এনজিও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কোনো কোনো এনজিও আইনি লড়াইকে কৌশল হিসেবে নিয়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আবার সুশীল সমাজ এবং অগ্রসর নাগরিক সমাজের সংগঠনও একাজে নিয়োজিত রয়েছে। নিম্নে দু'টি সুশীল সমাজ এবং অগ্রসর নাগরিক সমাজের সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো হলো।

খ. জনগোষ্ঠীভিত্তিক অ্যাডভোকেসির মূল মূল্যবোধ হয়ে থাকে অধিকারভিত্তিক এবং এডভোকেসি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অর্জিত সাফল্য ক্রমান্বয়ে অধিকারবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখে। এধরনের অ্যাডভোকেসি এবং অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অর্জিত সাফল্য যে শুধুমাত্র ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন আনে তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতা প্রয়োগের মাত্রা এবং স্বরূপেও পরিবর্তন আসে।

অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম নিয়ে দ্বন্দ্ব বা বিভ্রান্তি

আমরা কখনো কখনো ভ্রান্তিবশত এমন কিছু কার্যক্রমকে অ্যাডভোকেসি হিসেবে বিবেচনা করি, প্রকৃতপক্ষে যা অ্যাডভোকেসি নয়। আবার এমন কিছু কার্যক্রম রয়েছে যা সাধারণ অর্থে পরিচালিত হলে অ্যাডভোকেসি নয়, কিন্তু অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিচালিত হতে পারে, এসকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১. সক্ষমতা উন্নয়ন
২. তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ
৩. সামাজিক আন্দোলন
৪. রাজনৈতিক আন্দোলন

১. সক্ষমতা উন্নয়ন

সক্ষমতা উন্নয়ন বলতে এমন এক কার্যক্রম বোঝায়, যার মাধ্যমে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবের পরিবর্তন হয়। সক্ষমতা উন্নয়ন ও অ্যাডভোকেসি সমার্থক নয়; তবে সংগঠিত এবং কার্যকর অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অ্যাডভোকেসি কর্মীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ বলেই বিবেচিত হবে।

২. তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ

তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ তিনটি ভিন্ন মাত্রার কার্যক্রম; তবে সমন্বিতভাবে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। যে কর্মসূচির মাধ্যমে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য বা জ্ঞান জনগোষ্ঠীর কাছে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখে, তাই তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ- এই কার্যক্রম অ্যাডভোকেসি নয়, এই কার্যক্রমকে অ্যাডভোকেসি'র টুল বা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. সামাজিক আন্দোলন

সামাজিক আন্দোলন এমন এক ধরনের কাজ, যা সমাজের যে কোনো ইস্যুতে সংগঠিত হতে পারে। এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত হতে পারে এবং এর নেতৃত্বও তৈরি হতে পারে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এই ধরনের নেতাকে পরিস্থিতি উদ্ভূত নেতৃত্ব বলা হয়। কখনো কখনো সামাজিক আন্দোলন স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠলেও পরবর্তীতে স্থানীয় এমনকি জাতীয় পর্যায়ের সুশীল সমাজ এর সাথে যুক্ত হয়ে এটি জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে, দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত স্থানীয় আন্দোলন পরবর্তীতে জাতীয় ইস্যুতে রূপান্তরিত হয়। সামাজিক আন্দোলন কখনো কখনো সহিংস আন্দোলনে রূপ নেয়।

৪. রাজনৈতিক আন্দোলন

নির্দিষ্ট চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী বহু-সংখ্যক মানুষ যখন একত্রিত হয়ে দল গঠনপূর্বক রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলসমূহ রাষ্ট্র পরিচালনা, জনস্বার্থসহ বিভিন্ন ইস্যুতে নিজ দলের অনুসারীদের নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে তোলে এটাই রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজনৈতিক আন্দোলন স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিচালিত হতে পারে। রাজনৈতিক আন্দোলন যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থে পরিচালিত আন্দোলন, তথাপি কোনো অবস্থায়ই তা অ্যাডভোকেসি নয়। কেননা এই আন্দোলন দলগতভাবে পরিচালিত হয়, এর মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং দলীয় ম্যানিফেস্টো বাস্তবায়ন করা। রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় দল প্রায়শই অনড় অবস্থান গ্রহণ করে, বিরোধী পক্ষের প্রতি অনমনীয়, অসহিষ্ণু এবং কখনো কখনো নিষ্ঠুর আচরণও করে। আমাদের মত দরিদ্র দেশে প্রায়শই এই আন্দোলন সহিংসও হয়ে ওঠে।

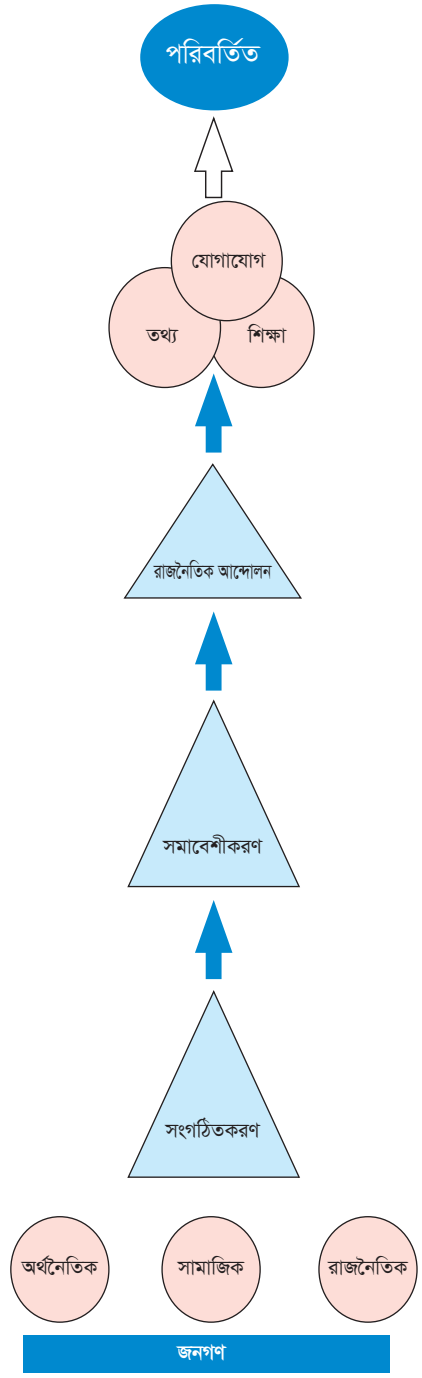

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সরকার যেভাবে দায়বদ্ধ

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সরকারের সত্যিকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন। সরকারের প্রতিশ্রুতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দও প্রয়োজন, অন্যথায় তা কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, আইন এবং কাঠামোগত সংস্কারও প্রয়োজন।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সরকার যেভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে:

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক নীতি ও আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং এই আইনের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমকে সংশ্লিষ্ট সকল নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- বাস্তবায়িতব্য সকল কর্মসূচি ও প্রকল্পে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় জনবল ও বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে এনজিও, সিবিও ও কর্পোরেট সেক্টরের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও বাস্তবানুগ করতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং তাদের কাছে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও সম্পদ স্থানান্তর করতে হবে।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ইস্যুতে অ্যাডভোকেসি করতে হলে করণীয়

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ইস্যুতে অ্যাডভোকেসি করতে হলে এনজিও ও কম্যুনিটিভিত্তিক সংগঠনকে নিম্নলিখিত বিষয়াবলিতে মনোযোগী হতে হবে:

- অ্যাডভোকেসি পরিচালনাকারী সংগঠনের কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ইস্যুটি সমন্বিত করতে হবে।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ইস্যুতে দেশে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে আর কোন্ কোন্ সংগঠন কাজ করছে তা জানা থাকতে হবে। তাদের সাথে নিয়মিত তথ্য বিনিময়, অভিজ্ঞতা ও শিখন বিনিময় এবং যৌথ কার্যক্রম গ্রহণের প্রচেষ্টা থাকতে হবে।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ইস্যুতে গবেষণা কার্যক্রম থাকতে হবে। এই ইস্যুতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি বিশ্লেষণ থাকতে হবে। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নসমূহ হচ্ছে:
  - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ইস্যুতে সরকারের নীতি ও কৌশলসমূহ কী?
  - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ইস্যুতে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া কী?
  - এই ইস্যুতে সরকারের বাজেট বরাদ্দের নীতি কী?
  - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ইস্যুতে নীতি ও কৌশলসমূহ যুগোপযোগী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা এবং তা কী বাস্তবায়িত হচ্ছে?
  - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ইস্যুতে সরকারের নীতি ও কৌশলসমূহের ভালো দিক ও দুর্বল দিকগুলো কী কী?
- সাংগঠনিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক সরকারের নীতি ও কৌশলসমূহ বিশ্লেষণের পরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন কোন ইস্যুতে অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করা প্রয়োজন।
- দেশে সমমনোভাবাপন্ন এনজিওসমূহের মধ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন ও সাধারণ অবস্থান তৈরি।

অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা চক্র (Advocacy Planning Cycle)

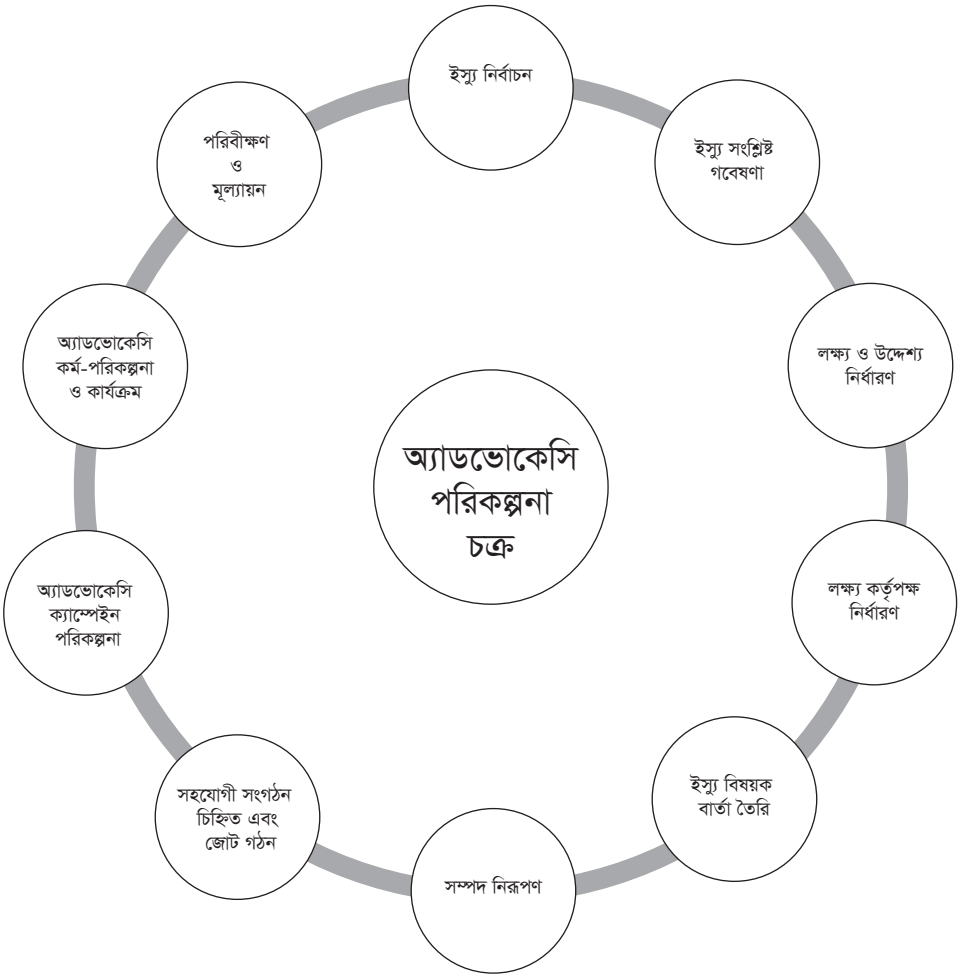

সুষ্ঠু পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করে কোনো কার্যক্রমের সাফল্য। কোনো জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের প্রভাবিত করার লক্ষ্যেই অ্যাডভোকেসি পরিচালিত হয়। অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা চক্র অ্যাডভোকেসি পরিচালনা দলের জন্য এমনই এক দিক-নির্দেশনা যার মাধ্যমে তারা খুঁজে পেতে পারেন অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের পুরো (step-by-step) রোড ম্যাপ। অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা চক্রকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; প্রাক-প্রস্তুতি, প্রস্তুতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন। তবে এটি মনে রাখতে হবে যে, সমগ্র অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম সুপরিকল্পিত এক কার্যক্রম যা ধাপে ধাপে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে হবে এবং এর প্রতিটি ধাপই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুসরণীয়, যদিও কোনো কোনো ধাপ একই সাথে পরিচালিত হতে পারে। চলমান পরিবীক্ষণ ও অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়নও পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

ইস্যু নির্বাচন

প্রচলিত নীতিমালা, বাস্তবায়ন কাঠামো ও পদ্ধতি এবং নীতি ও নীতি বাস্তবায়নকারীবৃন্দের মনোভাব ও আচরণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করে এবং ঐ প্রভাবের ফলাফল জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। উক্ত প্রভাবের সূত্র ধরে ভুক্তভোগী মানুষ ও অগ্রসর নাগরিক সমাজের উদ্যোগে যখন নীতি প্রণয়ন, সংস্কার ও নীতি বাস্তবায়নে কোনো কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্র বা সম্ভাবনা তৈরি হয়, এমন বিষয়কেই ইস্যু বলা হয়ে থাকে।

ইস্যু-সংশ্লিষ্ট গবেষণা

ইস্যু-সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে পলিসি ইস্যু অর্থাৎ অ্যাডভোকেসির মূল ফোকাসটি নির্ধারণ করতে হয়। অ্যাডভোকেসিতে নীতি গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা সর্বদাই সঠিক তথ্য ও প্রযুক্তির যোগান দেয়। অনেক ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নিজেই হয়ে উঠতে পারে শক্তিশালী যুক্তি। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইস্যু নির্বাচনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা সহজ হয় এবং ইস্যু বাস্তবায়নের সঠিক দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। ইস্যু গবেষণার মাধ্যমে সমস্যা ও তার কারণ চিহ্নিতকরণ, সমস্যার প্রকৃতি ও তার বিবরণ, ইস্যু অগ্রাধিকরণ সম্ভব হয়। গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়, নীতিজনিত ইস্যু কীভাবে ভুক্তভোগী জনগণকে প্রভাবিত করছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ

এড়ধষ বা লক্ষ্য হচ্ছে, অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের সুদূরপ্রসারী কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের স্বরূপ। লক্ষ্য অর্জন দীর্ঘমেয়াদি অ্যাডভোকেসি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অর্জিত হতে পারে। পলিসি অ্যাডভোকেসিতে অ্যাডভোকেসি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নীতি বিষয়ক যে পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা করা হয় তাই উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে নীতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভুক্তভোগী মানুষ যে সুফল অর্জন করবে তাই লক্ষ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রসঙ্গে অ্যাডভোকেসির উদ্দেশ্য হচ্ছে, আইনটি প্রণয়ন, সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করা এবং এর অনুমোদন। পক্ষান্তরে এই অ্যাডভোকেসির লক্ষ্য হচ্ছে, আইনে যে উদ্দেশ্য ও ফলাফল বর্ণিত হয়েছে তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের দুর্দশা লাঘব।

লক্ষ্য নির্ধারণ

অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদেরকে প্রভাবান্বিত করা, যার ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। সুতরাং অ্যাডভোকেসি গবেষণার লক্ষ্য হবে, কোন্ ধরনের পরিবর্তন আমরা দেখতে চাই তা চিহ্নিত করা এবং এই পরিবর্তনের জন্য কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহীতাকে প্রভাবান্বিত করতে হবে তা চিহ্নিত করা। এটা করতে গিয়ে নীতি প্রেক্ষিত বা পলিসি কনটেক্সট বিশ্লেষণ করতে হবে, যা আগেই দেখানো হয়েছে।

ভিন্ন ভিন্ন টার্গেট অডিয়েন্সের কাছে বার্তা পৌঁছানোর জন্য মাধ্যমও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে; যেমন:

টার্গেট অডিয়েন্স	মাধ্যম
মন্ত্রণালয়	স্মারকলিপি, দরখাস্ত, সভা (সেমিনার, ডায়ালগ ইত্যাদি) ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ
সাংসদ	স্মারকলিপি, দরখাস্ত, সভা (সেমিনার, ডায়ালগ ইত্যাদি) রেডিও, টেলিভিশনে টকশো
সংবাদ মাধ্যম	প্রেস বিজ্ঞপ্তি, প্রেস কনফারেন্স, ই-মেইল, ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ, টকশো
সহযোগী সংগঠন ও ব্যক্তি	সভা সমাবেশ, প্রচার উপকরণ, সংবাদ মাধ্যম, সেলিব্রেটি বা গণ্যমান্য ব্যক্তি, ওয়েবসাইট, ই-মেইল, ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ
জনসাধারণ	সভা সমাবেশ, প্রচার উপকরণ, সংবাদ মাধ্যম, সেলিব্রেটি (জনপ্রিয় ব্যক্তি), ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ

সম্পদ নিরূপণ

কোনো কার্যক্রমের শুরুতেই সম্পদ সম্পর্কিত বিষয় নিরূপণ করা উচিত। সম্পদ নিরূপণ এর চারটি দিক রয়েছে। যথা:

ক. কী সম্পদ?
খ. কত পরিমাণে প্রয়োজন হবে?
গ. কী আছে?
ঘ. সম্পদ সংগ্রহের সম্ভাব্য উৎস।

এটা সত্য যে, অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ করতে হলে কার্যক্রমের শুরুতেই সম্পদ সম্পর্কিত বিষয় নিরূপণ বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে; তা সত্ত্বেও প্রাথমিকভাবে তা নিরূপণ করা উচিত।

অ্যাডভোকেসি প্রচারাভিযান বা ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা

অ্যাডভোকেসি প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসচেতনতা সৃষ্টি অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে জনগণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। মনে রাখতে হবে, নির্ধারিত ইস্যুতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করা গেলে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও নীতি বাস্তবায়নকারীদের ওপর কার্যকর ও ইতিবাচক চাপ প্রয়োগ করতে পারবেন। ক্যাম্পেইন হওয়া চাই পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত। ক্যাম্পেইন বা প্রচারণা সংগঠিত করার আগে বিবেচনা করা উচিত কোন ধরনের জনগোষ্ঠীর সমর্থন লাভের জন্য কাজ করতে হবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় দ্রুত ও কার্যকর উপায়ে তাদের কাছে পৌঁছানো যায়?

সহযোগী সংগঠন চিহ্নিত করা ও এলায়েন্স গঠন

আন্দোলন বা ক্যাম্পেইন সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজন সমাজের অভ্যন্তরস্থ সকল পক্ষের সমর্থন ও তাদেরকে নিয়ে জোট গঠন। পলিসি অ্যাডভোকেসি সাধারণত কোনো সংগঠন, গ্রুপ বা কতিপয় ব্যক্তি এককভাবে পরিচালনা করতে পারে না। অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের জোট যেমন: নেটওয়ার্ক, কোয়ালিশন, এলায়েন্স ইত্যাদি গড়ে উঠতে পারে। এ ধরনের জোটের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কিছু পার্থক্য রয়েছে।

জোট গঠনের পর যা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে: SWOT এনালাইসিস অর্থাৎ-

S - Strengths শক্তি	W - Weaknesses দুর্বলতা
O - Opportunities সুযোগ	T - Threats ঝুঁকি

অ্যাডভোকেসি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি

অ্যাডভোকেসি চক্রের প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্তির পরে মূল অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম শুরু হবে। অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম এর সুসংগঠিত কর্ম-পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। ইতঃপূর্বে যে সকল ধাপ-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে ইস্যু নির্বাচন, ইস্যু বিশ্লেষণ, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, টার্গেট অডিয়েন্স বা লক্ষ্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ, অ্যাডভোকেসি বার্তা তৈরি, সম্পদ নিরূপণ ও সমাবেশ, অ্যাডভোকেসি প্রচারণা কৌশল নির্ধারণ ও জোট গঠন। অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম কর্ম-পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই শুরু হবে মূল অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম। এই পর্যায়ে ইতঃপূর্বে সম্পাদিত সকল প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পুনরায় পর্যালোচনা করে নেয়া উচিত। জোট বা সহযোগী সংগঠনসমূহের উপস্থিতিতে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো পর্যালোচনা ও প্রয়োজনে পুনঃবিন্যাস করে নেয়া যেতে পারে–

- অ্যাডভোকেসি বার্তা তৈরি
- অ্যাডভোকেসি প্রচারণা কৌশল নির্ধারণ
- সম্পদ নিরূপণ ও সমাবেশ
- পরিবীক্ষণ ও অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়ন

অ্যাডভোকেসি অ্যাকশন প্ল্যান বা কর্ম-পরিকল্পনার কোনো ধরা বাঁধা ছক নেই, তবে নিম্নরূপ ছকটি অনুসরণ করা যেতে পারে:

উদ্দেশ্য:					
লক্ষ্য কর্তৃপক্ষ					
কার্যক্রম	**নির্দেশক**	**সময়**	**দায়িত্ব কার**	**ঝুঁকি**	**অর্জন**

১. অ্যাডভোকেসির জন্য কেস ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া।
২. উদাহরণস্বরূপ দুই-একটি কেস উপস্থাপন এবং তার বিশ্লেষণ এখানে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

ছবি: ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

পরিশিষ্ট ১

'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি)'

'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি)' বা টেকসই উন্নয়ন বলতে ঐ ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝায় যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাও নিশ্চিত হয় আবার প্রকৃতি এবং বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমেও কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না। ভিন্নভাবে বললে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো, ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারটা প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৮৭ সালে, ব্রুন্টল্যান্ড কমিশনের রিপোর্টে। ২০০০ সালে শুরু হওয়া 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' বা এমডিজি অর্জনের সময় শেষ হয় ২০১৫ সালে। এরপর জাতিসংঘ ঘোষণা করে ১৫ বছর মেয়াদি 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল' বা এসডিজি। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে ২০১৬ থেকে ২০৩০ মেয়াদে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। ২০১৫ সালে জাতিসংঘ দারিদ্র্য বিমোচন, বিশ্ব রক্ষা এবং একটি নতুন টেকসই উন্নয়নের এজেন্ডা হিসেবে সকলের জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিতে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। এসডিজির লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন ও প্রচার করেছে জাতিসংঘ যা নির্ধারণ করা হয় ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সামিট' নামক সম্মেলনে। উল্লেখ্য যে, এসডিজি বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, এমডিজি বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে প্রতিস্থাপিত করেছে, যার মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৫ সালে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা হলো:

- এসডিজি ১. দারিদ্র্য বিমোচন
- এসডিজি ২. খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির উন্নয়ন ও কৃষির টেকসই উন্নয়ন
- এসডিজি ৩. সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা
- এসডিজি ৪. মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ
- এসডিজি ৫. লিঙ্গ সমতা
- এসডিজি ৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
- এসডিজি ৭. সকলের জন্য জ্বালানি বা বিদ্যুৎ সহজলভ্য করা
- এসডিজি ৮. স্থিতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণকালীন উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান ও কাজের পরিবেশ
- এসডিজি ৯. স্থিতিশীল শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা
- এসডিজি ১০. দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস
- এসডিজি ১১. মানব বসতি ও শহরগুলোকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল রাখা
- এসডিজি ১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার
- এসডিজি ১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ
- এসডিজি ১৪. টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা
- এসডিজি ১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার
- এসডিজি ১৬. শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ, সকলের জন্য ন্যায়বিচার, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং
- এসডিজি ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য এ সব বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের স্থিতিশীলতা আনা।

ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ
বাড়ি ১০, রোড ১০, ব্লক কে
বারিধারা, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ইমেইল: info@islamicrelief-bd.org
ফোন: (+৮৮) ০২ ২২২২৯৯১২৮, ০২ ২২২২৯৯১৩০
facebook.com/IRWBangladesh
www.islamicrelief.org.bd